MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
মে-জুন ২০২২
দাম : দশ টাকা

তেলের দাম কমাও

মজুতদার, সিন্ডিকেটের স্বার্থে আর কত দাম বাড়ানো হবে?

ই.ভি.এম দিয়ে ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চক্রান্ত করছে সরকার

বাসদ



ভোজ্যতেলসহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৯ মে বাসদের বিক্ষোভ মিছিল

ভোজ্যতেল, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি রোধ, দ্রব্যমূল্য এবং জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে তামাশা বন্ধ, সিন্ডিকেট ও মজুতদারদের শাস্তি এবং খাদ্য পণ্যের রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৯ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এবং জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড নিখিল দাস, সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, কমরেড ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, ঢাকা নগর কমিটির সদস্য কমরেড আহসান হাবিব বুলবুল।

সমাবেশে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ভোজ্য তেলের দাম এক লাফে লিটার প্রতি ৩৮ টাকা বাড়িয়ে সরকার প্রমাণ করেছে সে মজুতদার ও বাজার সিন্ডিকেটের সহযোগী ও

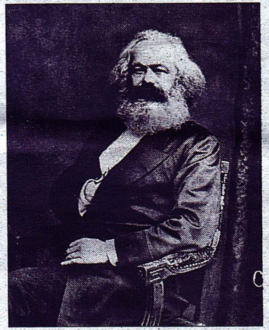
এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

তেল নিয়ে ব্যবসায়ী বান্ধব সরকারের তেলেসমাতি

বাজারেই নাকি সব নির্ধারিত হয়। এর নাম পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি। বাজারের প্রধান অংশীদার নাকি ভোক্তা? ভোক্তারা কেনেন বলেই তো বেচাকেনা জমজমাট হয়, ব্যবসায় সমৃদ্ধি আসে। কিন্তু বাংলাদেশে ভোক্তা এবং ভুক্তভোগী শব্দ দুটো এত কাছাকাছি যে, তাদের আলাদা করা যায় না। দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের কোনো মতামত কোনো ক্ষেত্রেই নেওয়া হয় না। সে রকমই তেল কিনে খান যারা তাদের কোনো মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।

সংখ্যায় তারা ৪ কোটি পরিবার কিন্তু কী এসে যায় তাতে? তেল যারা আমদানি করেন, পরিশোধন এবং বিপণন করেন তারাই তো দেশের হর্তাকর্তা। এই মহাজনদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫ থেকে ৭ জন এবং তাদের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কত দামে বিক্রি করলে তাদের সর্বোচ্চ লাভ এবং সর্বনিম্ন ঝুঁকি থাকে। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে সরকার সম্পর্কে বলা হয়, সরকার কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে না, শুধু সহায়তা করবে মাত্র। তবে কাকে সহায়তা করবে সে প্রশ্ন করার মতো বোকামি নিশ্চয়ই কারও করা উচিত হবে না। সরকার ব্যবসায়ীদেরকে সহায়তা করার জন্য এক পা বাড়িয়েই রেখেছেন। ব্যবসায়ীদের শুধু কষ্ট করে চাইতে হয়। বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের দাম

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১


মহামতি কার্ল মার্কস এর ২০৪তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা
(জন্ম : ৫ মে ১৮১৮ মৃত্যু : ১৪ মার্চ ১৮৮৩)

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

[মহামতি কার্ল মার্কসের ২০৪তম জন্মবার্ষিকীতে বর্তমান সময়ে গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁর লেখা মজুরি-শ্রম ও পুঁজি অংশবিশেষ ভ্যানগার্ড পাঠকের জন্য উপস্থাপন করা হলো। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে ভ্যানগার্ডে মুদ্রিত হবে।—সম্পাদক]

১৮৪৮ সালে শ্রেণি-সংগ্রাম যে সুবিপুল রাজনৈতিক আকার ধারণ করে তা পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন সময় এসেছে অর্থনৈতিক যে সম্পর্কের ওপর বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শ্রেণি প্রভুত্ব এবং মজুরদের দাসত্বের প্রতিষ্ঠা সেই সম্পর্কটি নিয়েই আরো খুঁটিয়ে আলোচনা করা।

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ব্যবসায়ীরা কথা রাখেনি; সরকার ব্যবসায়ীদের কথা রেখেছে

বাম গণতান্ত্রিক জোট



ব্যর্থ বাণিজ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবি

বাম জোটের বাণিজ্যমন্ত্রণালয় ঘেরাও

ভোজ্যতলসহ নিত্যপণ্যের দাম কমানো, বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ বাণিজ্যমন্ত্রীকে অপসারণ, সিন্ডিকেট-মজুতদারদের বিচার, সারাদেশে সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাল-জালিয়াতির নব কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে সরকার

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিশ্বজুড়ে শোষণ-লুণ্ঠন, বর্ণবাদী সহিংসতা, যুদ্ধ-যুদ্ধন্মোদনা, যুদ্ধাতঙ্ক, সাম্রাজ্যবাদী প্রভাববলয় বৃদ্ধির উন্মোত্ততা, উদ্বাস্তু জনস্রোতের অবিরাম বৃদ্ধি, জননিরাপত্তা ও গণ-অধিকার সংকোচন ইত্যাদি ক্রমাগত বেড়ে চলছে। মানুষের মধ্যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তাবোধ, শঙ্কা যতো বাড়ছে এর পেছনে মূল কারণের উপলব্ধি বোধ ততোটা তৈরি হচ্ছে না। বারে বারে ঘুরে আসা বিপদ-মহাবিপদ যে পুঁজিবাদের অর্থাৎ পুঁজিবাদী-সাম্রজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার ফলাফল তা স্পষ্ট হচ্ছে না। আমাদের দেশ গত ৫৩ বছর পুঁজিবাদী পথে হাটতে গিয়ে মুষ্টিমেয় একটা গোষ্ঠীর পর্বতচূড়ায় উঠার উন্নতি আর গরিষ্ঠ জনগণের সাগর, তলায় নেমে যাওয়ার অবনতি দশা তৈরি হয়েছে। জনগণ এবং শাসকশ্রেণি দুই মেরুর বাসিন্দা হয়ে আছে। কারণ শাসক হওয়ার জন্য জনগণের মতামতের ভোট লাগে না। ভোটার ছাড়া ভোট হয়ে যায়। দিনে ঝামেলা হলে রাতেও ভোটের কাজ সেরে নেয়া যায়, সামরিক-বেসামরিক নানা পোশাক বদল করে, হামলা-মামলা, গুম-খুন করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধর্মের বাণিজ্য করে বন্দনা গীতের সাথে উন্নয়নের বাজনা কানফাটানো শব্দ বাজিয়েও এখন আর পুরোনো কায়দায় চলা যাচ্ছে না। বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন, অর্ধেক জনসংখ্যা নারী মর্যাদা রক্ষায় আতঙ্কে ভীত। কর্মস্থলে, সড়কে মৃত্যুর মিছিল, বিদেশে টাকা পাচারের অসংখ্য কাহিনি, বেকারত্ব, কম মজুরি আইনি খড়্গ, বিদেশে ভোগান্তি শ্রমজীবীদের জীবনকে অতিষ্ট করে রেখেছে। তরুণ-যুব সমাজকে বিকৃত রুচি, মাদকাসক্তি, কিশোর গ্যাং, উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাবে ঠেলে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি অত্মহত্যা প্রবণতাও বাড়ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান ক্রমাগত নামছে। স্বাস্থ্য সেবারও বেহাল দশায় রোগীর রোগ মুক্তির আগেই পরিবারের আর্থিক ধস নামে। সব কিছু মিলে মানুষের জীবন রক্ষার চেয়েও শাসকদের গদি রক্ষা বড় হয়ে উঠেছে।

ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নাক গলিয়েছে। ভারত তো আগে থেকেই থাবা বিস্তার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করা বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতিতে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার বিষয়টি অর্থাৎ বিপ্লবী লড়াইয়ের সঠিক রাজনৈতিক সংগ্রামের লাইন নির্ধারণ করার প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লড়াই যতই হোক আজকের দিনে সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের নেতৃত্বে তা পরিচালিত না হলে, জনগণের সংগ্রাম কখনই তার ঈপ্সিত মুক্তি তথা বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আরও বিবেচনায় নিতে হবে দেশে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্ন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও তার নিরিখে শ্রেণিবিন্যাসকে যেমন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে হবে; ঠিক তেমনই দেশের রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নেও রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিবিন্যাসকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমরা বিপ্লব করতে চাই, অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণির দখল থেকে শ্রমিকশ্রেণির দখলে আনতে চাই। তাই আমাদের কাছে যে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাই সে সমাজের বিশ্লেষণটা অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র ও রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীনদের শ্রেণিচরিত্র জানা দরকার। কারণ তার উপর ভিত্তি করেই করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। এক কথায় রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশে বাম আন্দোলনে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের ভিত্তিতে সংগ্রামের নীতি-কৌশলগত ও করণীয় নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের, যা এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। বাম আন্দোলনে ঐক্য কিংবা বিভক্তির ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি প্রধান কারণ। আমরা জানি একটি দেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ ছাড়া বিপ্লবের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের লাগবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, মার্কসবাদ হচ্ছে একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যেমন প্রতিমুহূর্তে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয় তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থেকে এর উপলব্ধি ক্রমাগত সম্প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে। যারা যেখানে বিপ্লব করছেন তারাই মার্কসবাদী চিন্তায় নতুন সংযোজন করেছেন। আর যখন যুগের অবস্থানগত আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় তখন তার আলোকে পরিস্থিতিকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন, মার্কসের সময় পুঁজি অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে ছিল। পরবর্তীতে লেনিন দেখান যে, পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতামূলক স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে প্রবেশ করে ব্যাংক পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে। এর পণ্য রপ্তানি করার সনাতন চরিত্রের বদলে পুঁজি রপ্তানি করাই সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, লেনিন কর্তৃক পরিবর্তনের এ ব্যাখ্যা মার্কসবাদী বিজ্ঞানের একটা মৌলিক বিকশিত ধারণা। আবার দেশে দেশে বিপ্লব ও বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞান বিপ্লব সম্পর্কিত ধারণা নতুন নতুন পরিস্থিতিতে পড়ে মৌলিক না হলেও সংযোজন ঘটিয়ে চলেছে।

বাইরে থেকে সবাই পুঁজি ও পণ্যকে দেখেছে। কার্ল মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা আবিষ্কার করেন এবং এর সাহায্যে তিনি পুঁজি ও পণ্যের অন্তর্নিহিত নিয়ম ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পণ্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্য কী, সমাজ কীভাবে তৈরি হয়েছে, বিকশিত হয়েছে, এর ভিত্তি ও উপরি কাঠামো কী। এসকল বিষয়ের একটা সামগ্রিক চিত্র তিনি ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস হাজির করেছেন। এই সকল তত্ত্ব নির্মাণে তাঁরা অনেকের সহযোগিতা নিয়েছেন, তাদের গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন ও প্রয়োজনীয় রশদ নিয়ে তত্ত্বগত একটা সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গড়ে তুলেছেন।

উৎপাদন পদ্ধতি বুঝাটা গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, তার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় সমাজটা কেমন। এই বিশ্লেষণটা কার্ল মার্কসের একটা বিশাল আবিষ্কার। মানুষের আছে সমাজ, অন্য কোন প্রাণীর নেই, আছে যুথবদ্ধতা। মানুষও একটা সময়ে যুথবদ্ধ ছিল, পরবর্তীতে তারা সমাজবদ্ধ হয়। তাহলে সমাজ গঠনটা হলো কীভাবে? মানুষই একমাত্র প্রাণী যে উৎপাদন করতে পারে। উৎপাদন করতে গিয়ে তাকে উৎপাদনমুখী শ্রম ক্রিয়া-কলাপ করতে হচ্ছে। এ কাজটা করতে গিয়ে সে একা একা পারেনি অন্যদেরকে যুক্ত করতে হয়েছে। এখান থেকে মানুষ একটা সম্পর্কে এসেছে যাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক।

একটা সমাজ কখন বন্ধ্যাদশায় পড়ে আর সামনে এগোতে পারে না? যখন উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তখনই সমাজে অচল অবস্থা দেখা দেয়। বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সামাজিক তাগিদ হাজির হয়।

তা হলে উৎপাদন কী? মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য যাকিছু প্রয়োজন সেটা সৃষ্টি করাই হচ্ছে উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন হচ্ছে উপযোগ সৃষ্টি করা, যা মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণে সক্ষম। এটা হয় শ্রম প্রয়োগে বস্তুর অসংখ্য রূপান্তরের মাধ্যমে।

মানুষের জীবনধারণের জন্য চাই বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। যেমন, শস্য, মাছ-মাংস, জামা-কাপড়, মেশিনপত্র, ঘর, স্কুল-কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি হাজারো জিনিস্। প্রাকৃতিক বস্তু বা প্রকৃতি থেকে আহরিত বস্তুর উপর বিভিন্ন হাল-হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়ার নামই উৎপাদন। প্রকৃতিতে রয়েছে বিভিন্ন বস্তু, আর মানুষের রয়েছে শ্রম করার শক্তি। আলাদা আলাদাভাবে এগুলো কিছুই করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির বস্তু এবং মানুষের শ্রমশক্তি এই দুই মিলিত হলে তবেই দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হতে পারে। যেমন, কৃষক জমিতে (জমি-প্রাকৃতিক বস্তু) লাঙ্গল, ট্রাক্টর, কোদালের সাহায্যে চাষেরশক্তি (মানব শ্রম) দিয়ে ধান, আলু, পটল (দ্রব্য-পণ্য) উৎপাদন করে। অথবা কাঠুরিয়া বনে গিয়ে (বনের গাছ-প্রাকৃতিক বস্তু) কুঠার-করাত দিয়ে গাছ কেটে, সে গাছ থেকে কাঠ তৈরি করে, সে কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি করে। শ্রমিক তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে জামা-প্যান্ট ইত্যাদি তৈরি করে। এটাই হলো উৎপাদন।

অর্থশাস্ত্র সমাজের উৎপাদনকে তিন ভাগে ভাগ করেছে—১. বৈষয়িক উৎপাদন ২. ভাবগত উৎপাদন ৩. সেবা উৎপাদন।

প্রথমত, বৈষয়িক উৎপাদন অর্থাৎ বিষয় বস্তু উৎপাদন; বস্তু আকারে আমরা যা দেখি। যেমন, জামাকাপড়, ঘর-দালান, মেশিনপত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, ভাবগত, এটাকে মেধাগত-বুদ্ধিজাত উৎপাদনও বলা হয়। আমরা ইতিহাস, বিজ্ঞান দর্শন, ইত্যাদি পড়ি, কবি সাহিত্যিকদের কবিতা-উপন্যাস পড়ি, শিল্পীর আঁকা ছবি দেখি, শিল্পীর কণ্ঠের গান-সেতার-বাঁশি শুনি, এগুলোও এমনি এমনি পাওয়া যায়নি। তা সৃষ্টি করতে হয়েছে। এটা হলো ভাবগত উৎপাদন। তৃতীয়ত, মানুষ অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যায়, চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে। ডাক্তারের চিকিৎসাও একটা উৎপাদন। তা হলো সেবা উৎপাদন। মানুষ প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়ত করে, এর জন্য নানা ধরণের পরিবহন ব্যবহার করে। বাস, লঞ্চ, বিমান ইত্যাদি। আবার এ পরিবহন গুলো চালানোর জন্য চালক এবং তার সহযোগী লাগে, তারা এগুলো পরিচালনা করে। এটাও এক ধরনের উৎপাদন। এর নাম হলো সেবা উৎপাদন। একটা সমাজে এই উৎপাদনগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে। এই উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে বা এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয় তা বুঝতে আমাদের কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।

প্রথমত, উৎপাদন পদ্ধতি কী? উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে হয় উৎপাদন পদ্ধতি। যেমন, পুঁজিপতি মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত হয়ে যে উৎপাদন সম্পন্ন হয়, তা হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। এর আগে, জমিদার বা সামন্ত প্রভু ও ভূমি দাস মিলে যে উৎপাদন সম্পন্ন হতো তা হলো সামন্তীয় উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি।

আমরা দেখলাম উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে হয় উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা। তা হলে উৎপাদন শক্তি কী? উৎপাদন শক্তি হলো-মানুষ যেখানে শ্রম দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে শ্রমের ক্ষেত্র। আর লাগে হাতিয়ার এই দুইয়ে মিলে হয় উৎপাদনের উপায়। এর সাথে মানুষের কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম বা উৎপাদন সম্পর্কিত জ্ঞান এই মিলে হয় উৎপাদিকা শক্তি বা উৎপাদনের শক্তি। এখানে শ্রম বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রমশক্তি বা প্রয়োগকৃত শ্রম, শ্রমিক উৎপাদনের জন্য যে শ্রম দিয়ে থাকে। শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে-যেখানে শ্রম প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কল কারখানায়, জমি, খনি এগুলো হচ্ছে প্রয়োগের ক্ষেত্র। শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদনের হাল হাতিয়ার অর্থাৎ যা দিয়ে উৎপাদন করা হয়। যেমন : তাঁত যন্ত্র, সেলাই মেশিন, ট্রাক্টর, কাস্তে-হাতুড়ি, কম্পিউটার, লাঙল ইত্যাদি। তা হলে দাঁড়ালো শ্রমশক্তি + শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র + শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার বা শ্রমের উপকরণ + নব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এই মিলো হলো উৎপাদিকা শক্তি।

উৎপাদন সম্পর্ক কী? মানুষ যেহেতু একা একা উৎপাদন করতে পারে না, তাকে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। উৎপাদন হচ্ছে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সম্পন্ন হয় সম্মিলিত কর্ম প্রয়াসে। যে কোন যুগেই যে কোন উৎপাদন পদ্ধতিতে মানুষ সমবেত হয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। উৎপাদনকে কেন্দ্র করে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তাই উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন, বিলিবণ্টন ও ভোগ এগুলো যে কোন সমাজের অর্থনীতির মূল কাজ। ফলে, উৎপাদন পদ্ধতি না বুঝলে সমাজটাকে বুঝতে পারবো না। সমাজ বিশ্লেষণটা যদি সঠিকভাবে না করা যায় তা হলে সমাজ পরিবর্তনের কাজটা ঠিকমতো করতে পারবো না।

বাম রাজনীতিতে ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে কখন রাষ্ট্রটা কোন ধরনের রাষ্ট্র ছিল এর শ্রেণি-চরিত্র নির্ধারণ নিয়ে অনেক বিতর্ক এসেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাত্তোর জাসদ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে ডক্টর আখলাকুর রহমান একটা বই লিখে দেখালেন যে, কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনিই প্রথম দেখালেন বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে অবস্থান করছে। সে বই জাসদের বিপ্লবের স্তর নির্ধারনের ভিত্তি। পরবর্তীতে শিবদাস ঘোষের একটা বই আমরা পাই, যা তিনি এপ্রিল থিসিসের আলোকে লেনিনের চিন্তার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্র চরিত্র নির্ণয়ে প্রয়োগ করেছেন, সেই বক্তব্যও আমাদের সহায়তা করেছে।

লেনিনকে কেন এপ্রিল থিসিস রচনা করতে হয়েছিল? কারণ, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারকে অর্থাৎ সামন্ত রাজতন্ত্রকে হটিয়ে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলুশনারিরা বুর্জোয়া সরকারের সাথে আপস করলো এবং জনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে রাষ্ট্র পরিচালনায় শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে সময় বলশেভিকদের লক্ষ্য কী হবে, রণনীতি-রণকৌশল কী হবে ইত্যাদি প্রশ্নে তারা তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়লো। এই অবস্থায় ১৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে কমরেড লেনিন দেশে ফিরে পেত্রোগ্রাদের রেলওয়ে স্টেশনের ঐতিহাসিক ভাষণে বললেন, এখন আমাদের আরেকটি বিপ্লব করতে হবে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হবে। মাত্র নয় মাসের ব্যবধানে আরেকটা বিপ্লব! এ ছিল গতানুগতিক ধারণার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোনো শ্রেণির হাতে ছিল, অর্থাৎ নিকোলাস রোমানভের রাজত্বে অভিজাত সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে, নতুন শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গিয়েছে। এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবের প্রথম, মুখ্য এবং মৌলিক লক্ষণ-বিপ্লবের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-দুই অর্থেই। ততদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। বলশেভিকদের একটা অংশ মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পুঁজিবাদ সে মাত্রায় বিকশিত ও সে স্তরে উন্নিত হয়নি। তা ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। তাদের যুক্তি ছিল এইসব অপূরিত কাজ সমাপ্ত না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে সম্ভব-অর্থাৎ তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তখনও কাটেনি। তাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় লেনিন নির্দেশিত এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে সম্মেলনে।

এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে লেনিন বললেন, প্রত্যেক বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই প্রশ্ন না বুঝলে বিপ্লবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ হতে পারে না, নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো বলাই চলে না।

তখন বলা হয়েছে বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয় শাসন ক্ষমতায় কোন শ্রেণি আছে প্রধানত তাদের চরিত্র দিয়ে। জাসদ এপ্রিল থিসিসের বক্তব্য গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের রণনীতিকে কেন্দ্র করে রণকৌশলটা ঠিক ছিল না। আমাদের দল বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করেছি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই নীতির ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করছি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামনে প্রধান শত্রু হলো পুঁজিবাদ ও সহযোগী সাম্রাজ্যবাদসহ সকল প্রতিক্রিয়ার শক্তি, এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টি।

তা হলে বিপ্লবের স্তরগুলো কী কী। সামন্তবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ত-রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিপ্লব করেছিল তার নাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, ইংল্যান্ডের ক্রোমওয়েল বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব; জাপানের মেইজি বিপ্লব ইত্যাদি।

কিন্তু ইতিমধ্যে যখন বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করলো, অন্যদেশ দখল করছে, এখন সেই দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ উচ্ছেদ করে স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে বিপ্লব করেছে তাকে বলা যায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, আমেরিকা, আলজেরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি। কমরেড লেনিন দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই বিপ্লব হবে

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের ৮৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র



চারণ কবি মুকুন্দ দাসের ৮৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২১ মে ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া টিচার্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, চারণের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, কামরুজ্জামান ভুঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মুকুন্দ দাসের প্রকৃত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তার পিতার কর্মসূত্রে বরিশালে অবস্থান, সেখানেই তার বেড়ে উঠা ও শিক্ষা জীবন শুরু কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ থাকায় তার বেশি লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে এসে মুকুন্দ দাস স্বদেশ মন্ত্রে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তারই প্রেরণায় মুকুন্দ দাস সাধারণ কীর্তনীয় থেকে স্বদেশী গায়ক-অভিনেতা ও বাংলার চারণকবি হয়ে ওঠেন। ১৯৩৪ সালের ১৮ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

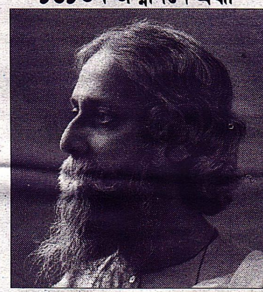
তার স্বদেশী যাত্রাপালা মাতৃভক্তি, ব্রহ্মচারিণী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, পল্লীসেবা, সাধন সংগীত, পথ সাথী ইত্যাদি রচনা ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে দ্রোহ জাগায়। ফলে ব্রিটিশ সরকার তার যাত্রাপালার উপরে ৩২ বার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাকে জেলে যেতে হয়। শাসকের শত অত্যাচারের মুখে ও প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েও তিনি তার লড়াই চালিয়ে গেছেন। যার ফলে তিনি বহু গুণিজনের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী যাত্রাপালা দেখে তাকে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে বলে সম্বোধন করেছিলেন। কবি নজরুল ১৯২৫ সালে হুগলিতে তাকে 'চারণ সম্রাট' বলে অভিহিত করেছেন। 'দশ হাজার প্রাণ আমি যদি পেতাম, বা বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও, অথবা ভেঙে ফেল রেশমি চুড়ি বঙ্গ নারী কভু হাতে আর পরো না, ইত্যাদি গান সেই সময় দেশের মানুষের মুখে মুখে ছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় তার রচনা বাঙালির জাতীয় জীবনে দারুন দেশপ্রেমের সঞ্চার করেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাত্রাপালা ও গান রচনা করে মুকুন্দ দাস সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লড়াই করেছিলেন। আজ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশেও সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানি প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে সস্তা শ্রম, তেল-গ্যাস-কয়লা, খনিজ সম্পদ লুট করছে।

নেতৃবৃন্দ মুকুন্দ দাসের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

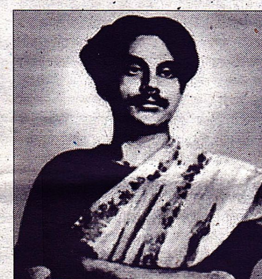
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা



জন্ম : ৭ ম ১৮৬১;
মৃত্যু : ৭ আগস্ট ১৯৪১

সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি–প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত–এদের দ্বারা জগতের কোন সুখ নেই শোভাও নেই এবং সুবিধেও নেই। (ছিন্নপত্রাবলি : দীঘাপতিয়া জলপথে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা



জন্ম : ২৫ মে : ১৮৯৯ মৃত্যু : ২৭ আগস্ট ১৯৭৬

বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জ্জন না দিই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, 'মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি'। হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান-মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি–ভরা মহাগৌরবময় মৃত্যু। তখনও মুক্তির সেই যুগান্তরের নবযুগেও, আমরা পলে পলে দাসত্বে, মনুষ্যত্বহীন আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মত অধোদিকেই গড়াইয়া চলিতেছি!
[গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ প্রবন্ধ]

নওগাঁয় গৃহবধূ আমেনা ও শিশুপুত্র হত্যার বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

বগুড়া

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ২ মে নওগাঁর মান্দায় যৌতুকের বলি গৃহবধূ আসমা ও শিশুপুত্র হামজা হত্যার বিচার এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে সাতমাথায় মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আআহ্বায়ক অ্যাড. সাইফুল ইসমাল পল্টু, মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিবরিয়া হোসেন, জেলা অর্থ সম্পাদক নিয়তি সরকার নিতু, পূজা প্রামানিক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩০ এপ্রিল মান্দায় শয়নঘরে এই গৃহবধূ ও তার শিশুপুত্রের লাশ পাওয়া যায়। প্রতিবেশীরা এ হত্যাকাণ্ডে তার স্বামী যুক্ত থাকতে পারেন বলে ধারণা করছে।

এই গৃহবধূকে তার স্বামী প্রায় যৌতুকের জন্য চাপ দিত, নির্যাতন করত। তিনমাস আগেও তার স্বামী যৌতুক দাবি করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় শালিসের মাধ্যমে আবার সে স্বামীর বাড়িতে আসে। তার স্বামীর বাড়ি থেকে বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া চেষ্টা হচ্ছে। নেতবৃন্দ এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানান।



নরসিংদীতে পোশাক নিয়ে তরুণীকে হেনস্তা ও শ্লীলতাহানির ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড, দিলরুবা নূরী এক বিবৃতিতে, নরসিংদীতে ঢাকা থেকে বেড়াতে যাওয়া এক তরুণীর পোশাক পরা নিয়ে তাকে হেনস্থা করা ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কারো পোশাকের ভিন্নতার কারণে নোংরা মন্তব্য, হামলা ও শ্লীলতাহানি করা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সাথে যুক্তদের বিচার দাবি করে বলেন, নাগরিকদের রুচি সংস্কৃতির ভিন্নতায় পছন্দমতো পোশাক পরা গণতান্ত্রিক অধিকার। পোশাকের ভিন্নতা অপরাধ না এর জন্য কাউকে হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করা অন্যায় ও অপরাধ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার এই শক্তি সমাজে নারী বিদ্বেষী মানসিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেশের নানা জায়গায় ধর্মীয়সভা, ওয়াজ মাহফিলেও নারীর বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সমাজে আধুনিক মানসিকতার চর্চা, যুক্তিবাদী মননের প্রসার ও বিজ্ঞানমনষ্কতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগই নেই। ফলে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বেড়েই চলেছে, যা একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশের পরিপন্থি। কারো কোন কাজ ঠিক মনে না করলে তার সাথে কথা বলা যায়, যুক্তি করা যায় কিন্তু কোনভাবেই তাকে আক্রমণ করা যায় না এই গণতান্ত্রিক বোধটুকুও শেষ করে দেয়া হচ্ছে। যা সামনের দিনে আরও ভয়াবহতা নিয়ে হাজির হবে। যদি না অবিলম্বে সমাজে যুক্তিবাদী মনন ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার, চর্চা পরিবেশ তৈরিতে উদ্যোগ না নেয়া হয়, তা হলে প্রগতিবাদী মানুষই অসহায় হয়ে পড়বে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং যে কূপমণ্ডূক চিন্তার কারণে এরকম ঘটনা ঘটে সেগুলোর ভিত্তি উপড়ে ফেলতে কার্যকরী উদ্যোগের আহ্বান জানান।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করা বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

দশম পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে–এই বিপ্লবের নাম হবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব–যেভাবে চীনে মাও সেতুং নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে হবে। আগে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়ার নেতৃত্বে হতো এখন কমরেড লেনিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণিকে নিতে হবে, সেখান থেকে আসছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

চীনের যে বাস্তবতা ছিল–এর একটা অংশ ছিল জাপান-ব্রিটিশসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে, অন্য এলাকায় চলছে সামন্ত প্রভু জমিদারদের শাসন, এখানে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ দুটাকে উৎখাত করতে হবে, বিপ্লবের নাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্রে চলে যাবে।

আমাদের দেশের অনেক বামপন্থি দলের বিপ্লবের স্তর এখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? কারণ তারা মনে করে, দেশে এখনও পুরোপুরি না হলেও আধাআধি কিংবা শক্তিশালী অবশেষ নিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বা দালাল বুর্জোয়ারা। এদের উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা আনতে হবে এবং একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তার পর একে টেনে সমাজতন্ত্রে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা বলেছি, ১৯৭১ সালে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে আধাকাচড়া হলেও এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কারণ, পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতার যুগে বুর্জোয়ারা যে মাত্রায় যতটুকু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করতে পেরেছিল এখন প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে তারা আর সেরকম করতে পারবে না। এরা দিনে দিনে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আজকে তারা বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন, সংস্কৃতির বিকাশকে আধুনিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে মানবতার জয় গান গাইতে পারবে না, আইন-কানুনকে সবার জন্য নিশ্চিত করতে পারবে না, রাজনীতিকে হীন স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। তাই বুর্জোয়াকে দিয়ে তাদের উত্থানের যুগের অঙ্গীকার অনুযায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক, জাতিসত্তাকে মর্যাদার আসনে বসাতে পারবে না।

আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার অনেকগুলো কাজ এরা সম্পূর্ণ করতে পারবে না। এরা হচ্ছে যুগের সীমায় বাঁধা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া। উত্থানেরকালে ইউরোপীয় ক্লাসিকাল বুর্জোয়ারা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতায় যা করতে পেরেছিল এরা তা পারবে না। কেউ কেউ শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুৎসুদ্দি বা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া এবং এরা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। আবার কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন এদের মধ্যে একটা অংশ প্রগতিশীল এবং আরেকটা অংশ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল। স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই সে সময় প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সাথে মিলে অসম্পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণতায় নিয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রগতিশীল বুর্জোয়ার সাথে থেকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অংশ নিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। প্রগতিশীল উপাদান কী? সেটা হচ্ছে শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহনীয় পর্যায়ে কিছু অবস্থান নেয়া, সমাজতন্ত্রের কথা বলা ইত্যাদি। তাই এই বুর্জোয়ার সাথে যদি বামপন্থি কমিউনিস্টরা যুক্ত হয় তা হলে প্রগতিশীল অংশের হাতকে শক্তিশালী করলে শ্রমিকশ্রেণি তাদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াবে, তাদের অধিকার বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চে নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। সে তত্ত্বের ভিত্তিতে বুর্জোয়া একনায়কতান্ত্রিক বাকশালেও তারা যোগ দিয়েছিল। এখন অবশ্য সেটা যে ভুল পদক্ষেপ ছিল তা তারা স্বীকার করছেন। তবে আমরা যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাদের জায়গা ঠিক সেরকম নয়। পিকিংপন্থি নামে যারা চিহ্নিত ছিলেন তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া মানে সাম্রাজ্যবাদের কমিশন এজেন্ট। এরা স্বাধীন বুর্জোয়া নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করার বিনিময়ে সুবিধা ভোগ করে কমিশন ভোগ করে। যারা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করে–তারা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া। স্বাধীনতার পর থেকে যারা শাসন ক্ষমতায় এসেছে বা আছে তারা কেউ জাতীয় বুর্জোয়া নয়। এরা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরা সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। আমরা বলেছি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এরা জাতীয় বুর্জোয়া। এদের গঠনকালীন বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব কিছু মিলে এরা বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে ও স্বার্থে প্রধানত রাজনীতি করে। তারা পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তাদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রকে সেভাবে পরিচালিত করে। শুরুতে মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদের বক্তব্য অন্যদের কাছে পরিচ্ছন্ন করা কঠিন ছিল। এখন বামপন্থিদের অনেকেই বিষয়টা খুব সহজে ধরতে পারছেন। তবে এখনো অনেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন ত্যাগ করতে পারছে না, কেউ কেউ মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা তারা জনগণের সামনে বোধগম্যভাবে হাজির করতে পারছে না। এখনো কেউ কেউ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছেন। কেউ বলছেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী রূপান্তরের কথা। কেন এই সকল তত্ত্ব? এটার ব্যাখ্যা পরিষ্কার নয়। কারণ কথার অর্থে হলেও অনেকে বলছে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কাঠামোতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই শাসকশ্রেণি লুটেরা দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণির পক্ষে কাজ করছে। কথা হলো বুর্জোয়াশ্রেণিকে যে কোণ থেকেই দেখি না কেন, এদের সাথে যোগসাজস করে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা হবে না, সমাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত করা যাবে না। এ যদি হয় উপলব্ধি তা হলে বিপ্লবের স্তর নিয়ে বিভ্রান্তিতে না ভুগে, বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রাম অগ্রসর করতে করতেই বিভ্রান্তি কাটবে। যারা সংগঠনের নামের সাথে জাতীয় মুক্তির কথা রেখে শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলছেন সেটাও চিন্তা ও কাজে অসঙ্গতি তৈরি করবে। এরা সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি এবং রণকৌশলের ধারণা বলতে কী বোঝায়। নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এখনো দেশে দেশে কমিউনিস্টরা সেই পাঠ গ্রহণ করছে। রণনীতি একটা দীর্ঘকালীন সময়ের বিষয়, যা কেবলমাত্র অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেই পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট যুগে বা কালপর্বে রণনীতি বাস্তবায়নে আন্দোলনের জোয়ার এবং ভাটার সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় রণকৌশল। অর্থাৎ যুদ্ধের নীতি ও যুদ্ধ পরিচালনা কৌশলই হলো রণনীতি-রণকৌশল।

এ বিষয়ে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যেহেতু এই সমস্ত উপাদানগুলি এক বাক থেকে অন্য বাকের মাঝে পড়ে যায় ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়. সে কারণে সমগ্র যুদ্ধকে পরিব্যপ্ত না করে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন একটি নির্দিষ্ট লড়াই সাপেক্ষে সে বিশেষ পর্বে রণকৌশল অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় বা হতে পারে।

আজকের বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কর্পোরেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বুঝতে হলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্যটা বোঝা দরকার। লেলিন তার একাধিক রচনায় এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখালেন, 'ব্যক্তি মালিকানা এবং উদ্বৃত্ত শোষণ–এই দুই ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সাদৃশ্য থাকলেও জমির মালিকানার চরিত্র, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা শক্তির অবস্থা–এই চারটি বিষয়ে দুই ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

অনেকের দাবি আমাদের কৃষিতে বর্গাপ্রথা আছে, এর মানে সামন্তীয় উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চলেছে। এখন বর্গাপ্রথা আগের মতো বাধ্যতামূলক চিরায়ত নেই, এটা এখন চুক্তিভিত্তিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কৃষক মালিকের সাথে দেনদরবার করে, কে কত বিনিয়োগ করবে, ফসল কে কত অংশ পাবে এর ভিত্তিতে জমি বর্গা নেয়। যদি বর্গাচাষির লাভের সম্ভাবনা থাকে সে জমি চাষ করে না হয় করে না। চুক্তিভিত্তিক বর্গা সামন্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এখন উল্টো বর্গা প্রথাও চালু হয়েছে। যেমন, একজন ধনী ব্যবসায়ী ছোট কৃষকের কাছ থেকে তার জমিটা নেয় এবং বলে তোমাকে অত টাকা দিব, এতে ওই কৃষকের লাভ হলে সে জমিটা নগদ টাকার বিনিময়ে দিয়ে দেয়। অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতেই এই কাজটা হয়। আরেকটা কথাও তারা বলছে, কৃষি মজুর মাসভিত্তিক, বছরভিত্তিক প্রথাগত ধারার মাধ্যমে কাজ করে। আমরা বলছি, এখন আর এরকম ব্যবস্থা চালু নেই। অর্থাৎ বাধ্য শ্রম আর নাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সামন্তবাদে উৎপাদন হয় ভোগের জন্য আর পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় মুনাফার জন্য। তাহলে কৃষকরা যে চাল উৎপাদন করে তার বেশিরভাগ সে ভোগ করে। তাহলে যে চাল উৎপাদিত হয় সেটা যদি ভোগে যায়, এটাতো পুঁজিবাদের লক্ষণ না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, চালটা জাতীয় বাজারের পণ্য কিনা? এই চাল দ্রব্য হিসেবে ভোগও করতে পারে আবার বিক্রি করতে পারে পণ্য হিসেবে। চাল বাংলাদেশের যে কোন বাজারে বিক্রি করা যায় কিন্তু সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলে যে কোন বাজারে সেটা বিক্রি করতে পারে না এবং তা জাতীয় বাজারের পণ্য হয় না। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য, যে চালটা কৃষক ভোগ করে আবার পণ্য হিসেবে বিক্রয়ও করতে পারে, এ কারণে এটা সম্ভাবনাময় পণ্য।

পুঁজির নির্ভরতার প্রশ্ন এসেছে। আগে বাংলাদেশের কথিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ)-এর বৈঠক হতো প্যারিসে। বাংলাদেশের উন্নয়নের কৌশল, পরিকল্পনা, অর্থায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো প্যারিস কনসোর্টিয়ামে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে বসে থাকতো, টাকার জন্য। '৮০'র দশকে অবস্থা যে রকম ছিল এখন আর অবস্থা আগের মতো নয়। আমরা বলেছিলাম বুর্জোয়ারা যদি বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ও এই নির্ভরতার দুইটা দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুঁজি খাটাতে চায়, কিন্তু খাটাতে পারছে না, তারা বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফের মাধ্যমে সে পুঁজি খাটায়। বাজার ধরে রাখতে ও বিস্তৃত করতে তৎপর থাকে, এটা বুর্জোয়ারা জেনেই সেখানে যায়। আবার বুর্জোয়ারা নির্ভরতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং নিজ দেশের বুর্জোয়াকে শক্তিশালী করে। আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা এখন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদের উপর অতবেশি নির্ভর করে না। এ বুর্জোয়ারা দিনে দিনে এখন অনেক আত্মনির্ভরমুখী। যদিও এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বাইরে কোন পুঁজিবাদই টিকে থাকতে পারে না। এখানে দরকষাকষি যেমন থাকে তেমনি অসম লেনদেনের গাটছড়াও থাকে।

বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার মতো বাংলাদেশেও বিতর্ক আছে, এখানে কোন শ্রেণি বিপ্লব করবে? বাংলাদেশে কী শক্তিশালী পুঁজিবাদ আছে?। এখানে শিল্পের বিকাশ হয় নাই, শ্রমিক শ্রেণিও বিকশিত হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী মূল শক্তি যেহেতু বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণি সেহেতু এখানে কী ধরনের বিপ্লব হবে। এখানে যেটা দেখা দরকার, সমাজে শ্রমিকরা সংখ্যায় কত, কৃষকরা কত? এখন সমাজে অগ্রসরমান শ্রেণি কোনটা? শ্রমিক, কৃষক নাকি পেটি বুর্জোয়া? সে জায়গায় এসে সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন সমস্ত জায়গায় শ্রমিকশ্রেণিই সামনে চলে এসেছে। অগ্রসরমান শ্রেণি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণি বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার কাজটা করবে।

শ্রমিকশ্রেণি কার নেতৃত্বে বিপ্লব করবে? তারা বিপ্লব করবে একটা সর্বহারাশ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে। সর্বহারাশ্রেণির পার্টিটা কেমন, এর বৈশিষ্ট্য কী, চরিত্র কী? বুর্জোয়াশ্রেণি যে ধরনের রাজনৈতিক শক্তি, সাংগঠনিক কাঠামো, দল পরিচালনার সক্ষমতা, নীতিমালা ও হাতিয়ার দিয়ে সামন্তবাদকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছিল, সে দিনের তুলনায় অনেক অগ্রসর চেতনা, অধিক সংগঠিত শক্তিশালী হাতিয়ার, উন্নততর বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা দল ছাড়া সর্বহারাশ্রেণির উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

বুর্জোয়ারা সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছিল। সেই ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তারা স্লোগান তুলেছিল সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা। আওয়াজ তুলেছিল গণতন্ত্র-সেক্যুলারিজম ও নারীমুক্তির। কিন্তু তারা এর পূর্ণ প্রয়োগ বাস্তবায়ন কোথাও করতে পারেনি। কেন পারেনি? কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলে সমাজে সাম্য আসবে না আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে সাম্যের যত স্লোগান দিক তাতে বৈষম্য দূর হবে না, সমতাবিহীন সমাজে সমমর্যাদা স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্র আসবে না।

আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল কেমন হবে? আমরা ধারণা নিয়েছিলাম কমিউনিস্ট লিগের ঘোষণাপত্র ও ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার থেকে। কাল মার্কস ধারণা নিয়ে আসলেন–যে আদর্শগত চেতনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব করেছিল, যে দল গঠন করেছিল ওই ধরনের দল দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির চলবে না। শ্রমিকশ্রেণির দল করতে হলে নতুন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি লাগবে, সাম্যগামী সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিপূরক আদর্শগত জ্ঞানজগতের একটা পরিমণ্ডল প্রথমে গড়ে তোলা দরকার। কমিউনিস্ট ইশতেহার ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বইতে পরিষ্কারভাবে বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বন্ধনে যৌথচেতনায় শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথনির্দেশও তারা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমেই সর্বহারাশ্রেণির বিপ্লবী দলের আদর্শগত চেতনা ও সাংগঠনিক বোধ সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছিল। সংগঠনের বিকাশের ধারাবাহিতায় লেনিন মেনশেভিকদের সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে দেখান কমিউনিস্ট

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করা বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

১২ পৃষ্ঠার পর

পার্টি সংগঠনের মূলনীতি যা ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় সেখান থেকে আমরা শিক্ষা পাই। লেনিন-স্তালিন বলেছিলেন, দল পরিচালনার জন্য একদল পেশাদার বিপ্লবী লাগবে। যারা দলের স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থকে একীভূত করে দেবে। একই সাথে বিশ্বের দেশে দেশে যারা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছিলেন ও পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের ধারণা সমৃদ্ধ করে গেছেন। এগুলোই হলো আমাদের দল গড়ে তোলার ভিত্তি ও আমাদের নিজস্ব সংগ্রামী অভিজ্ঞতার সংযোজন। এর সাথে সকল স্তরের শ্রমজীবী মানুষের ক্রমাগত অংশগ্রহণ ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতার নিত্য নতুন সম্প্রসারণ।

তাহলে আগামী দিনে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ হবে, সেই সমাজের একটা প্রতিফলন ঘটতে হবে এই দলে। সকালের শিশির বিন্দুতে যেমন করে সূর্য প্রতিফলিত হয়, তেমন যেই সমাজ সর্বহারাশ্রেণি নির্মাণ করবে তার প্রতিফলনও বিপ্লবী দলে দেখা যেতে হবে। সেটা কেমন? সেখানে থাকতে হবে ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা যৌথ বন্ধন। এখানে ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে বিপ্লবী সহমর্মিতার নিদর্শন আলো ছড়াবে। কীভাবে হবে? যতক্ষণ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি থাকবে ততক্ষণ এটা হবে না। সম্পত্তি নানা সূত্রে কতোটা আছে কিংবা নাই তার চেয়ে বড় কথা হলো সম্পত্তির মালিকানাকে দর্শনগত, আদর্শিক ও নৈতিকতার দিক থেকে সমর্থন করি কিনা যে, সম্পত্তি অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিকভাবেই কোন ব্যক্তি সম্পত্তিরই ন্যায়নীতিগত ভিত্তি নাই। সম্পত্তি কোথা থেকে এসেছে? আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে কেউ সম্পত্তির মালিক ছিল না, দাস ব্যবস্থায় দাস মালিকরা সম্পত্তির মালিক হয়েছে অন্যায় শাসন শোষণের ওপর ভিত্তি করে। সামন্ত সমাজে সামন্ত প্রভুরা সম্পত্তির মালিক হয়েছে কীভাবে? সামন্ত সমাজে কীভাবে পুঁজিপতিশ্রেণি গড়ে উঠেছে এবং পুঁজিবাদী সমাজে মালিকরা সম্পত্তির মালিক হয়েছে। ভারতবর্ষের সম্পত্তির মালিকানার ইতিহাসটা কেমন? ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সম্পত্তির মালিক ছিল উপনিবেশিক দখলদার ব্রিটিশরা, এর আগে মোগলরা ছিল মালিক। এখানে ব্রিটিশ আমলে প্রথমে খাজনার বিনিময়ে জমির মালিক হয়েছিল যারা তারা হচ্ছে জমিদার। শুরুতে ছিল পাঁচসালা মালিকানা, পরবর্তীতে দশসালা এরপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরা একদিকে যেমন ব্রিটিশদের অনুগত অন্যদিকে তাদের শাসনের খুঁটি। অর্থাৎ যতদিন খাজনা পরিশোধ করতে পারবে তত দিন মালিক থাকবে। তাহলে মালিকানার উৎস হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা, অন্যায়, শোষণ-লুণ্ঠন। এর বাইরে কোন মালিকানা নাই। এটা কে মেনে নিবে? সমাজ বিকাশের ইতিহাস যদি কেউ জানে, তা হলে সে জানে যে সম্পত্তির মালিকানার ইতিহাস ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত অন্যায্য সুযোগ লাভ ও অন্যকে বঞ্চনা করার ইতিহাস। তাহলে আমরা কি এটা মেনে নিতে পারি? পারি না। মালিকানা ব্যবস্থা হয়তো এখনই উচ্ছেদ হয়ে যাবে না কিন্তু যারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইটা করবে তাদের নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে যে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি হচ্ছে অন্যায়। এই অন্যায় নির্মূল করাই হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই বিষয়ে একমত হওয়া ছাড়া বিপ্লবী হওয়া যাবে না ও বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। মূল কথা হলো জনগণের সম্পত্তি জনগণের কাছে যাবে। একদিন বিশ্বের সম্পদ বিশ্বের মানুষের হবে, বিশ্বের সকল মানুষের অখণ্ড মানবিক সত্তার সমাজ হবে। সেটা হবে সাম্যবাদ। এখন জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে জনগণের পার্টি, সম্পদ যাবে পার্টিতে। কিন্তু আমাদের দেশের বামপন্থি দলের নেতাদের সম্পদ বেড়েছে পার্টির সম্পদ বাড়েনি। নীতিগতভাবে আমাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা বিপরীত মুখী। আমরা দলের সম্পদ বাড়াতে পেরেছি নীতিগত সংগ্রামের কারণে। আমাদের দলের নেতাদের সম্পদ ক্রমাগত কমতে থাকবে আর দলের সম্পদ বাড়তে থাকবে। তার প্রমাণ, আমরা যাত্রা করেছিলাম রিকশা গ্যারেজ থেকে এখন আমাদের নিজস্ব জায়গায় অফিসের পর্যায়ে এসেছি। কমরেডদের এবং জনগণের টাকায় আমরা এটা করেছি। আমরা ওই চেতনায় বিশ্বাস করি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা জনগণের সাহায্য-সহায়তায় অর্জিত যৌথ সম্পদে অনেক বড় বড় কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রয়োজনের তুলনায় এখনও তা নগণ্য হলেও এটাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগায় বর্তমান সংগ্রামকে জীবন্ত ও চলমান রাখে।

অনেকে নীতিগতভাবে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন কিন্তু প্রয়োগে তারা আসতে পারেন নাই। আমরা বলেছি দলের একটা কাঠামো যেমন থাকবে, তেমনি দলটা গড়ে উঠবে ও পরিচালিত হবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। দলের নেতৃত্ব, দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ব্যক্তি সম্পত্তি, ব্যক্তি মালিকানা এবং তার থেকে উৎসারিত সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই করছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি-অভ্যাস, আবেগের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়েই আদর্শিক লড়াইটাও শক্তিশালী হয়। এই সংগ্রামটা যদি না থাকে তা হলে একটা বিপ্লবী দল বিপ্লবী চরিত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি প্রশ্ন উঠে, সবাই কী মুহূর্তে এই সম্পত্তি এবং সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দলে আসতে পারবে? ব্যাপারটা এত সরলীকরণভাবে দেখার বিষয় না। সম্পত্তি তিনি যেভাবেই পেয়ে থাকেন–সেটা উত্তরাধিকারী সূত্রে হোক, দান গ্রহণ সূত্রে হোক বা নিজের অর্জনে হোক এ থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামটা নিজের জীবনে এবং দলের জীবনে জারি রাখতে হবে। প্রথমত, স্বীকার করা যে, ব্যক্তি মালিকানার ধারণা অন্যায়, দ্বিতীয়ত, সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া। যারা এখনও সম্পত্তি ধারণ করে দলের নেতৃত্বের জায়গায় আসবেন তাদের এই সংগ্রামটায় নামতে হবে। ব্যক্তিগত সংগ্রামের পাশাপাশি পারিবারিক সংগ্রামও আমাদের করে যেতে হবে। আমরা জানি অসংখ্য দেহ কোষের সমন্বয়ে দেহ, তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের কোষ হচ্ছে পরিবার। পরিবারগুলোর সমন্বয়ে ও যোগাযোগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। প্রত্যেকটা পরিবার হচ্ছে পুঁজিবাদের এক একটা কোষ। না হলে পুঁজিবাদ বসবাস করে কোথায়। এই পরিবারগুলোতে সম্পত্তি অর্জন করা, তা ধারণ করা, সেটাকে রক্ষা করার জন্য পরস্পর পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সংঘাত, সংঘর্ষের লিপ্ত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, হানাহানি-মারামারি ইত্যাদি করছে। পুঁজিবাদ যত দিন টিকে থাকবে এটা আরও বাড়তে থাকবে। তার বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদর্শভিত্তিক পরিবার তথা সমাজতান্ত্রিক চেতনাকেন্দ্রিক পরিবার গড়ার সংগ্রাম করতে হবে। আদর্শগত সংগ্রামে রূপান্তরিত বড় পরিবারগুলো সম্পত্তিকেন্দ্রিক ভাবমানসগত পরিবার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আদর্শভিত্তিক পরিবারে উন্নিত হওয়া একটা বিপ্লবী পার্টির বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আমরা ইতিহাস নির্ধারিত পথে ব্যক্তিমালিকানার সমাজ উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে একটা সভ্যতা নির্মাণ করার সংগ্রাম করছি। সে সমাজের প্রতিফলন এই দলের মধ্যে থাকবে। সে পথে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বুর্জোয়াদের যে কোন ধরণের সক্ষমতা পরিণত হয় তাদের ব্যক্তিগত পুঁজি ও লাভালাভে। যেমন, একজন ভালো লিখতে পারে, একজন ভালো বলতে পারে, একজন ভালো গাইতে পারে, একজন মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে এটা তার ব্যক্তিগত পুঁজি হয়ে যায়। যে যে-ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে সেটা তার পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। আর বিপ্লবী দলে একজন সদস্যের যা কিছু দক্ষতা-যোগ্যতা সেটা সর্বসাধারণের যৌথ সম্পদে রূপান্তরিত হয়। একটা হলো ব্যক্তিগত পুঁজি আরেকটা হল যৌথ সম্পদ। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যেকের এক রকম ক্ষমতা-দক্ষতা থাকবে না, এচিন্তা বাস্তবও নয় কিন্তু সবার ব্যক্তিগত দক্ষতা একটা যৌথ শক্তি-সামর্থ্য নির্মাণ করবে। কেউ দূর থেকে সমর্থন করে দলে ভূমিকা রাখছেন, কেউ দশটা টাকা দিয়ে সহযোগিতা করছেন, তারও একটা ভূমিকা আছে, কেউ পাঁচটা মানুষকে দলে টানার চেষ্টা করছে তারও একটা ভূমিকা আছে। কেউ লেখালেখি করে ভূমিকা রাখছেন। কেউ সংগঠিত লোককে পরিচালনা করে ভূমিকা রাখছে। কেউ শ্রমিক-কৃষক-নারীদের মধ্যে কাজ করে ভূমিকা রাখছেন। এসবকিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভালাভে রূপান্তরিত হচ্ছে না, যৌথ সম্পদে শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। সমাজ ব্যক্তির কাজের স্বীকৃতি দিবে কিন্তু ব্যক্তি স্বীকৃতির জন্য কাতর হবে না। আমাদের সমাজে কেউ যদি একটু বিশেষ জায়গায় এগিয়ে যায়, তখন সে মনে করে আমি তো অন্যের চেয়ে এগিয়ে গেলাম, আমার তো গুরুত্ব বেশি। আমি কত বেশি লোকের প্রশংসা পেলাম, জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলাম–এটা হচ্ছে পুঁজি, ভাবের পুঁজি। এই পুঁজিতে টাকার মুনাফা নাই কিন্তু ভাবের মুনাফার মানসিকতা কাজ করে। আমরা শুরু থেকে দলের মধ্যে এ বোধ নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি যে, এটা একটা আদর্শভিত্তিক পরিবার। কোন আদর্শ? সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের আদর্শ। সেটা কেমন? পারস্পরিক সহযোগিতামূলক। যৌথ জ্ঞানের ভাণ্ডার, যৌথ শক্তি-সামর্থ্য রচনার নিরন্তর সাংগঠনিক, রাজনৈতিক প্রয়াস।

এখানে প্রত্যেকে ভূমিকা পালন করে যাবে কিন্তু তাদের দক্ষতা-যোগ্যতাকে তারা পুঁজিতে রূপান্তরিত করবে না। পুঁজিপতি দুই ধরনের, একটা হলো ভাবগত পুঁজিপতি আরেকটা হলো বস্তুগত পুঁজিপতি। ভাবের পুঁজি ও অর্থের পুঁজি দুইটার শ্রেণি চরিত্র একই। এপর্যায়ে আমাদের নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমি ৪০-৪১ বছর ধরে দলের দায়িত্বে থাকার কারণে, নাম-ধাম পরিচিতির কারণে আমার মধ্যেও কোন কোন সময়ে অজান্তে এসব বিষয় এসে যেতেও পারে বা অতীতে আসেনি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের দলে এখন যারা কেন্দ্রীয় দায়িত্বে এসেছে তারা কিন্তু পদের কথা ভাবেনি এবং এনিয়ে কোন অবস্থান গ্রহণ করেনি বা চিন্তাও করেনি বরং ভেবেছে কীভাবে দলকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক তাদেরও যৌথতার সন্ধানে সচেতন সংগ্রাম করে যেতে হবে।

আমাদের কংগ্রেসে নতুন কমিটি হয়েছে, কমিটিতে যারা আসেন নাই তারাও কিন্তু ভালোই কাজ করছেন। কে কোথায় আছেন হিসাব মিলাচ্ছেন না। সর্বোচ্চ সাধ্যে কাজকে ভাবনায় রাখছেন। বিপ্লবী আন্দোলনে কাজের নীতি হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ সাধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে কাজ করবে। যৌথ সংগ্রামকে বিকশিত করার জন্য, রক্ষা করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। কিন্তু বিনিময়ে আমার প্রাপ্তি কী এটা আমি হিসাব করবো না। অন্যেরা করবে। কারণ আমি হিসাব করতে গেলে, সেটা ভাবের পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যদি আমাদের দলে এই সংগ্রাম না থাকতো তাহলে পার্টি আজকের এই জায়গায় আসতে পারতো না। আমরা '৮৩ সালে একবার ধাক্কা খেলাম। তখন দল গঠনের প্রশ্নে বিরোধের বিষয়গুলো জানেন। আমরা বলেছিলাম, জনগণের উপর নির্ভর করে ও তাদের সহযোগিতা নিয়ে এ দল চলবে। কারণ যেই জনগণকে নিয়ে বিপ্লব করবো, তাদের যদি সহযোগিতা এই জায়গায় আনতে না পারা যায়, তাহলে এই দল বিপ্লবের নেতা হতে পারবে না। জনগণ হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি, তাদের টাকা, তাদের ঐক্য দিয়েই দল এগোবে। শুধু দলের কিছু নেতা-কর্মী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে বিপ্লব হবে না। জনগণ প্রতিটি কর্মসূচিতে যে সহযোগিতা করছে তার প্রমাণতো আমাদের কাছে আছে, মানুষ বিগত দিনে যেমন সহযোগিতা করেছে বর্তমানেও করছে, বরং আমরা জনগণের সাথে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারি না। শুরুতে দলের তহবিলের জন্য জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তোলাবাজ মাস্তানদের চক্রান্তে আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। যাদের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা নিয়েছি, সে দোকানদাররা আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য দোকানদারদের কাছে গেলে তারা বলেছে, এরা চাঁদাবাজি করেনি। আমরা এটাকে সংগ্রামের একটা নীতিগত দিক হিসেবে নিয়ে *বিপ্লবী দলের অর্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে* পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছি। এভাবেই জনগণ, আমাদের কর্মী-সমর্থক শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা থাকবে এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

আমরা কী পুঁজিবাদের আক্রমণের বাইরে থাকতে পারছি? না, পারছি না। কারণ, পুঁজিবাদ আছে মানে সে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শক্তি নিয়ে আছে। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা এবং নেতৃত্ব কি সমাজের বাইরে। যেহেতু বিপ্লবী কর্মীরা সমাজে বসবাস করে, তাই পুঁজিবাদী সমাজের ভাবগত আক্রমণ প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপরও আসতে থাকবে, আমরা মার্কসবাদী বিজ্ঞানের হাতিয়ারে সেটাকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করতে থাকবো। এটা কীভাবে হবে? এই সংগ্রামটা করতে হবে যৌথভাবে। একা একা পারা যাবে না। বুর্জোয়া আক্রমণ সব সময় আসে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, আর সর্বহারা প্রতিরোধের শক্তি পায় যৌথতায়। যখন সর্বহারা একা হয়ে যায়, চিন্তায়-ক্রিয়ায়, তখন সে পুঁজিবাদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে যায়। যখন সে যৌথ সংগ্রামে দেহ-মন এক করে এটাকে মোকাবিলা করে তখন পুঁজিবাদ পরাস্ত হয়ে যায়। এখনও আমাদের অনেক দুর্বলতা বের করা যাবে কিন্তু আমাদের লড়াই ছিল এবং আছে। এক দল কমরেড একটা পর্যায় পর্যন্ত অতিক্রম করেছে পরবর্তীতে আর পারেনি, সেখান থেকে আরেক দল কমরেড সামনে এগিয়েছে, এই করতে করতে আমরা একটা পর্যায়ে এসেছি। যারা পারলো না, কেন তারা পুঁজিবাদী আক্রমণের শিকার হয়ে গেলেন? কী ছিল তাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনের সংগ্রামের ঘাটতি? আদর্শিক ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নতি সাধনের সংগ্রাম, প্রচেষ্টায় তাদের কী ঘাটতি ছিল? যৌথতায় কী দুর্বলতা ছিল? যদি জনগণের মাঝে সংগ্রামটা ঠিক ঠিক মতো করতে পারতো তারাও অগ্রসর হতে পারতো। সে দুর্বলতাটা আমাদের খুঁজে বের করা ও তা দূর করার সংগ্রাম করা দরকার। তবে বেশিরভাগ কমরেডরাই পিছিয়ে গেলেও দল বিরোধী, নীতি-আদর্শ বিরোধী হয়নি। অনেকেই ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। এবারে দলের প্রথম কংগ্রেসে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

এখন আমাদের দেখতে হবে রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কী, উৎপাদন পদ্ধতি কী? রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছে তাদের শ্রেণিচরিত্র কী? আরেকটা হচ্ছে যে শ্রেণি বিপ্লব করবে, সে শ্রেণির দল।

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

২০ মে চা-শ্রমিকদের 'মুল্লুক চলো' আন্দোলনের ১০১তম বার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের আলোচনাসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজার



২২ মে '২২ দুপুরে সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে মৌলভীবাজার শহরে লাল পতাকা মিছিল ও বিকেলে শহরের এম. সাইফুর রহমান অডিটোরিয়ামে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজী পাশীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ঘোষের সঞ্চালনায় চা-শ্রমিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ফেডারেশন কমিটির উপদেষ্টা অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, অ্যাড. জুনায়েদ আহমদ, আবু জাফর, অ্যাড. আবুল হাসান, সত্য নাইডু, প্রণব জ্যোতি পাল, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় নারীবিষয়ক সম্পাদক ফ্লোরা বাবলি তালাং, ফেডারেশনের সহসভাপতি ও ইউপি সদস্য কাজল রায়, বীরেন কালিন্দী, লিটন মৃধা, চন্দন বোনার্জী, মিঠুন বোনার্জী, খায়রুন আক্তার, কিরন বৈদ্য, ভজন ভুমিজ, প্রেম কুমার পাল, সবুজ গৌড়, অসিত বুনার্জী, গণেশ বড়কুমী, লালন পাহান, প্রণব বাগতী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশে চা উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজিতে। উৎপাদন বেড়েছে, চায়ের দাম বেড়েছে, মালিকের মুনাফা বেড়েছে, সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে। বিপরীতে বেড়েছে চা-শ্রমিকদের বঞ্চনা, শ্রম শোষণ, কমেছে প্রকৃত মজুরি, কর্মসংস্থান ও সংবিধানে অর্জিত অধিকার। বিশ্বের কোথায়ও ১২০ টাকা মজুরি শ্রমিক পাওয়া যাবে না একমাত্র বাংলাদেশের চা-শ্রমিক ছাড়া। এটাও নতুন ধরণের রেকর্ড। মজুরি নির্ধারণের যত ধরণের মানদণ্ড আছে এর কোন নিয়ম কী চা-শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে ক্রিয়াশীল? এক কথায় উত্তর, না। মুক্ত বাজারের ধাক্কায় নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জাঁতাকলে পিষ্ট চা-শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হয় না। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৮২৪ ডলার, (৯০ টাকা ডলার ধরলে ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক ১ লাখ ১১ হাজার টাকা), সেখানে চা-শ্রমিকের মজুরি কত? শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চা-শ্রমিকরা বাংলাদেশের মূলধারার মানুষের তুলনায় কমপক্ষে ৩ গুণ মজুরি বৈষম্যের শিকার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চা-শ্রমিকরা প্রায় ২ শ বছর এ দেশে বসবাস করার মধ্যদিয়ে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু ভূমির মালিকানার স্বীকৃতি পায়নি। অথচ চা বাগানের মালিকরা নামমাত্র মূল্যে লাখ লাখ একর ভূমি বন্দোবস্ত পেয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চা-শ্রমিকরা সংবিধান অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, ভূমির অধিকার, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পাওয়ার কথা কিন্তু তারা এগুলো থেকে বঞ্চিত। দুঃখ করে চা-শ্রমিকরা বলেন, চা বাগান প্রতিষ্ঠার ১৬৮ বছর হয়েছে কিন্তু এখনো চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৬৮ টাকা হলো না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন করার পথে নানা বাধা থাকায় একটি মাত্র ইউনিয়ন যা মালিকের আজ্ঞাবহ, তাই তাদের নেতৃত্ব শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না, শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলনও জোরদার হচ্ছে না।

যে চা মানুষের ক্লান্তি দূর করে, চাঙা রাখে, সামাজিকতা রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে সেই চা-শ্রমিকদের ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা আর সমাজের এক প্রান্তে ঠেলে রাখা কত দিন চলবে? পরাধীন দেশে তারা মুল্লুক চলো আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, আজ কী তারা মর্যাদা নিয়ে বাঁচার মতো মজুরি আন্দোলন গড়ে তুলবে না?

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে, দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকাসহ, গ্রাচ্যুয়িটি ৫% মুনাফা বন্টনের বিধান, ভূমির স্থায়ী মালিকানা, অবসরপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের পেনশন ও রেশন হিসেবে সপ্তাহে শ্রমিক প্রতি ৫ কেজি এবং নির্ভরশীল প্রতিজনে ৩ কেজি চাল ও প্রতিমাসে ২ কেজি চা-পাতা দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে অসুস্থদের চিকিৎসা ও দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ, নিরিখের অতিরিক্ত কাঁচাপাতা উৎপাদনে এবং ছুটির দিনে কাজ করার জন্য দ্বিগুণ হারে মজুরি, শিক্ষা-কর্মসংস্থানে বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করার দাবি জানায়।

আসন্ন বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বাজেটের ৪০% বরাদ্দের দাবি



বোরো ধানের দাম মণ প্রতি ১২০০ টাকা নির্ধারণ ও প্রতি ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে কমপক্ষে ৫০ লাখ টন ধান খোদ কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করার দাবিতে ২৫ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের মানববন্ধন-সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক নিখিল দাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা নগরের সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, শ্রমিক নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, নারী নেত্রী রুখশানা আফরোজ আশা, ছাত্রনেতা মুক্তা বাড়ৈ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রদীপ সরকার।



আসন্ন বাজেটে কৃষি খাতে উন্নয়ন বাজেটের ৪০% বরাদ্দ, ধানসহ ফসলের লাভজনক দাম ও আর্মি রেটে গ্রামীন রেশনিং চালুর দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সোনারগাঁ উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১৫ মে কাইকারটেক হাটে হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সোনারগাঁ উপজেলা শাখার সভাপতি বেলায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার ফোরামের সদস্য সেলিম মাহমুদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জেলার সভাপতি প্রদীপ সরকার, ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ রাতুল, বাসদ সোনারগাঁ উপজেলা কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সহসাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সোহাগ।

ঈদের দিনে বেতন বঞ্চিত বেকা গার্মেন্টস শ্রমিকদের অনশন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাহমুদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সহসভাপতি ধীমান সাহা জুয়েল, কবি রঘু অভিজিত রায়, শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম শরীফ, রুহুল আমিন সোহাগ, আউয়াল, নুর জাহান, মুজাহিদ, তানিয়া, ফরিদ, মিরাজ।

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, বেকা গার্মেন্টস এর ৭০০ শ্রমিক ৩ মাস যাবৎ বেতন পায়নি ও ঈদ বোনাসও পায়নি। ২২ এপ্রিল অবৈধভাবে মালিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। মালিক কর্তৃপক্ষ ও বেপজা এপ্রিল মাসে কয়েক দফা বেতন দেয়ার তারিখ দিলেও বেতন দেয়নি। শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলে পুলিশ লাঠিপেটা ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে লাঠিপেটা করে কিন্তু তিন মাসের বেতন বোনাস আটকে রাখা ও বেআইনিভাবে কারখানা বন্ধ করার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে নাই। কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকরা বেপজা, জেলা প্রশাসক, শিল্প পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় লিখিত অভিযোগ দিলেও কেউ সমস্যা সমাধান করেনি। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ও সমস্য সমাধানে এগিয়ে আসেনি। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ দেশবাসী আজ ঈদের আনন্দ করছে। অন্যদিকে বেতন বোনাস না দেয়ায় বেকা গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারেনি, পোশাক কিনে দিতে পারেনি। তাই আজ তারা নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে অনশনে বসে কান্না-আহাজারি করছে। সরকার উন্নয়নের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে, দুর্নীতি-লুটপাট হয়, কিন্তু বেকা গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস এর মাত্র ৫ কোটি টাকা ঈদের আগে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেয়নি। এই ৭০০ শ্রমিক এর বঞ্চনা আমাদের গোটা দেশবাসীর জন্য লজ্জার। শ্রমিকদের ঈদের দিনে অনশন পালন মালিক বা সরকারের বিবেকে দংশন করেনি। এই অনশন শ্রমিকের আন্দোলনের একটা অংশ। ঈদের পরে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের এ আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে। আমরা স্কপসহ বিভিন্ন শ্রমিক ফেডারেশনগুলি বেকা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনে পাশে থাকবো। শ্রমিক ফ্রন্ট সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনসহ নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের ৩টায় শেমাই খাওয়ানোর মধ্যদিয়ে অনশন কর্মসূচি শেষ হয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করা বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য

১৩ পৃষ্ঠার পর

দল কেন দরকার? দরকার এ কারণে যে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটা সংগঠিত শক্তি, এই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মোকাবিলা বা পরাস্ত করা যাবে না। একটা সংগঠিত শক্তিকে তার চাইতে বড় শক্তি দিয়ে আঘাতে আঘাতে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হয়। বুর্জোয়ারা সংগঠিত শক্তি, তার চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে জনগণের শক্তি। এই জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে আছে, তাদের সর্বহারা আদর্শের ভিত্তিতে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে তারা বুর্জোয়া শক্তিকে সমস্ত দিক থেকে পরাস্ত করে ফেলতে পারে। জনগণের শক্তিকে বিকশিত করার বাস্তব অবস্থা বিরাজমান আছে। এই বাস্তবতা দুই ধরনের, একটা হচ্ছে অবস্থিত বাস্তবতা আরেকটা হচ্ছে বৈপ্লবিক বাস্তবতা। অবস্থিত বাস্তবতা হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু আর বৈপ্লবিক বাস্তবতা দুর্বল হলেও সেটা বিকাশমান। কিন্তু আমরা যদি বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পারি, বুঝতে না পারি এবং সেই বাস্তবতা অনুযায়ী কাজ না করি, তাহলে বিদ্যমান বাস্তবতার চাপে পড়ে আমাদের যে শক্তি আছে সেটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, বুর্জোয়ারা কায়িক শ্রমিক এবং মানসিক শ্রমিককে তাদের সুবিধার জন্য আলাদা করে ফেলেছে। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার এরা হচ্ছে মানসিক শ্রমিক। যারা অফিস-আদালতে অনেক বড় পদে আছেন তারাও মানসিক শ্রমিক। কিন্তু ডাক্তার যদি ক্লিনিকের মালিক হয়, তাহলে সে আর শ্রমিক থাকবে না, সে হয়ে যাবে মালিক। যদি ইঞ্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠানের মালিক হয় তাহলে তাকে আর মানসিক শ্রমিক বলা যাবে না। বুর্জোয়ারা মানসিক শ্রমিক আর কায়িক শ্রমিকের মধ্যে একটা দেয়াল তুলে দূরত্ব তৈরি করেছে।

আমরা পেশাজীবীদের সংগঠন করছি কেন? কারণ, বুর্জোয়ারা মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তৈরি করেছে, সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে উভয়ের মধ্যে একাত্ম হওয়ার মনোভাব তৈরি করার জন্য। তাদের মধ্যে যেমন পেশাকেন্দ্রিক স্বার্থের একটা বিষয় আছে অন্যদিকে এই বোধ সৃষ্টি করা যে, কায়িক এবং মানসিক শ্রমজীবীদের শ্রমের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বস্তুগত সম্পদ এবং ভাবসম্পদ, উভয় সম্পদের আত্মসাৎকারী হলো বুর্জোয়ারা। এই আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে তাই একত্রে লড়াই করতে হবে।

একটা কাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রটা যদি ভেঙে যায়, নিচের দিকে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। সমস্ত জনগণের চেতনার মানকে একই স্তরে তোলার জন্য বহু দিন সময় লাগে। এই অবস্থা সাম্যবাদের আগে পর্যন্ত নিয়ে আসা কঠিন। এখানে একটা শৃঙ্খলা বোধ কাজ করতে হয়। শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য নেতৃত্বকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কমরেডদের চেতনার মান একটা স্তরে উন্নীত করার জন্য নেতৃত্বকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আবার কর্মীদেরও একটা ভূমিকা আছে। কর্মীরা যদি নেতৃত্বের সকল কাজে সহযোগিতার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে নেতৃত্বের একার পক্ষে কোন কাজ সফলভাবে করা সম্ভব হবে না। এখানে উভয়ের কাজের ও সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ও জবাবদিহিতামূলক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হতে হবে। নেতৃত্ব কর্মীদের চেতনার একটা মানে তুলবে আর কর্মীরা নেতৃত্বকে রক্ষা করবে এগিয়ে নেবে। যারা অন্যের অযোগ্যতা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তারা কালক্রমে অধিক যোগ্য হিসাবে গড়ে ওঠেন। অন্যের ঘাটতিপূরণ প্রচেষ্টা ছাড়া নিজের ঘাটতিপূরণ হয় না। অন্যকে পাল্টানোর চেষ্টা না করে নিজেকে পাল্টানো যায় না।

আমরা দলের মধ্যে যে সংগ্রামটা জারি রেখেছি–কমরেড়রা যদি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সহযোগিতা সংগ্রহের দায়িত্ব না নিতেন, তাহলে নেতাদের সে দায়িত্ব নিতে হতো। নেতৃত্ব হয়তো ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অনেক বেশি টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু তাতে পার্টির চরিত্র বদলে যাবে। আমরা কাজকে ছোট-বড় ভাগ করি না। প্রয়োজনের নিরিখে অংশ নেই। পুঁজিবাদী সমাজে যে কাজের দাম নেই, গুরুত্ব নেই, ছোট কাজ ভাবা হয়, বিপ্লবের প্রয়োজনে সে কাজ যারা স্বেচ্ছায় করে আমরা তাদের সম্মান দেই, মর্যাদার আসনে রাখি, হয়তো তারা কোন পদে থাকে না। নেতৃত্বের দিক থেকে মনোভাব থাকতে হবে আমরা দিবো বেশি নিবো কম, এই মনোভাব দলের মধ্যে তৈরি করতে হবে। নেতৃত্ব দলের জন্য দায় হবে না সম্পদ হবে। দল চেষ্টা করবে কোন কমরেড যাতে বিপন্ন না হয়ে যায়। আমাদের শ্রমিক কমরেড সরওয়ার, হানিফ এবং রঞ্জু অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। এরা যখন অসুস্থ ছিল সবসময় চেষ্টা করেছে যাতে তারা দলের বোঝা না হয়ে যায়। সব কমরেডরা মিলে দলের সবধরনের সম্পদ বাড়াবে আবার ব্যক্তিগতভাবে কোন কমরেড দুর্দশায় পড়লে দল সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়াবে। আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে, দল যাতে একটা সামর্থের জায়গায় যেতে পারে। কোন একটা বিষয়ে দলের সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে কিন্তু দেখতে হবে সেটা কী ব্যক্তিস্বার্থে ইচ্ছাকৃত করা হচ্ছে না দলের স্বার্থে। এইভাবে বিচারটা করতে হবে। ভুল আমাদের হতে পারে কিন্তু দেখতে হবে ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছি কী না এবং পরবর্তীতে সে একই ধরণের ভুল যাতে না হয়, তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বুর্জোয়া আক্রমণ যখন আসে তখন আগে দলকে রক্ষা করতে হবে, তার পর ভুল থেকে বের হওয়ার সংগ্রাম করতে হবে। সমাজে বৈষম্য যত বাড়বে সামাজিক ভারসাম্য তত নষ্ট হয়ে যাবে আর বৈষম্য যত কমবে সমাজ তত সুন্দর হয়ে উঠবে। পুঁজিবাদী সমাজ সকল অন্যায়-জুলুম, শোষণ-বঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি, খুনখারাবির কারণ। মানুষ কাজ পেলে তো চুরি করবে না। মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে সে অসহায় অবস্থাজনিত ফলাফল থেকে মানুষকে মুক্ত করা যাবে না। ঘরে খাবার না থাকলে পুলিশ দিয়ে চোর ঠেকানো যাবে না। রাস্তার নৈরাজ্য ঘরেও ঢুকবে, কোন কিছু রেহাই পাবে না। সমাজে, রাস্তায় যখন নৈরাজ্য বিরাজ করে তখন ঘরে আমরা আনন্দে বিভোর থাকলে সেই নৈরাজ্য ঘরে ঢুকে যাবে। অপরাধ হচ্ছে সামাজিক অসঙ্গতির সৃষ্ট ফসল। এটা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিষয় নয়। হয়তো আমরা এই সময়ে সামাজিক জীবনে কার্যকর বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো না কিন্তু দলের অভ্যন্তরে সেই নৈরাজ্য থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবো। আমরা দলের কমরেডদের আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে পারবো না কিন্তু এই সংকটের কারণ ধরাতে পারলে সেটার চাপটা কমে আসবে। দলের কমরেডদের পারস্পরিক সহযোগিতা যত বাড়বে যৌথতা যত বাড়বে সংকটের মোকাবিলা করার সক্ষমতাও তত বাড়বে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির গ্রেডপয়েন্ট বৃদ্ধি, প্রত্যাহার দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন যোগ্যতায় গ্রেডপয়েন্ট বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমান। ২৩ মে এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন যোগ্যতায় নতুন যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়। এর ব্যাপক অংশকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। ফলে [illegible] গ্রেডপয়েন্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশাল অংশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দ্বারকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এটা সরকারের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা কোন যুক্তি হতে পারে না। অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষা সংকোচনের এই নীতির ফলাফল ভালো হবে না।

নেতৃবৃন্দ এই চূড়ান্ত ছাত্র স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

লাইসেন্স প্রদানের নামে প্রতারকচক্রের নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১ খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই খসড়া নীতিমালা বিভিন্ন মহলের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করে দ্রুতই ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রনয়ন করার কথা রয়েছে। এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬.১ ধারায় বলা হয়েছে কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইজিবাইকের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে বিআরটি-এ এবং সংখ্যা নির্ধারণ করবে ঐ এলাকার যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (আরটিসি)। বরিশালে বিআরটি-এ বা আরটিসি'র কোন কর্তৃপক্ষ ও ইজিবাইকের লাইসেন্স সম্পর্কে এধরনের কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন ঘোষণা দেয়নি।

আমরা মনে করি ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বরিশালসহ সারাদেশে শ্রমিকরা লাইসেন্সের দাবিতে আন্দোলনের এক সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হবার কারণে অনেক কুচক্রী মহল যারা এই শ্রমিকদের জিম্মি করে চাঁদা তুলত তারা এসব অপকর্ম আর করতে পারছেনা। বর্তমানে সংগ্রাম পরিষদের রায়ে ইজিবাইকের বৈধতা ঘোষণা হওয়ায় এসব চাঁদাবাজরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা এসব প্রতারক ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একইসাথে আমরা এই ধরনের ভিত্তিহীন প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য এবং লাইসেন্সের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান না করার জন্য বরিশালের ইজিবাইক শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন বিষয়ে হাইকোর্টের রায় বা খসড়া নীতিমালা সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন-সংগ্রামের ফলেই অর্জিত হয়েছে। সামনের দিনেও শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এই লাইসেন্স আদায়ে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি এবং শ্রমিকদের সেই আন্দোলনে যুক্ত হবার আহবান জানাই।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির অপতৎপরতা বন্ধ কর

শেষ পৃষ্ঠার পর

জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদে সহসাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এর নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সভা পরিচালনা করেন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় নেতা ডা. সাজেদুল হক রুবেল।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জ্বালানি খাতে ভুলনীতি ও দুর্নীতি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। নেতৃবৃন্দ ভুলনীতি ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত ও শাস্তির দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইনে আছে, যদি কোন কোম্পানি মুনাফা করে থাকে তারা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করতে পারবে না। দেশে ৭টা বিদ্যুৎ বিতরণী কোম্পানি আছে, এরা সবাই লাভ করছে। তাই এনআরসি দাম বাড়ানোর জন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না এবং গণশুনানিও করতে পারে না। এর পরও গণশুনানির আয়োজনের মধ্য দিয়ে সরকার নিজেই নিজের আইন ভঙ্গ করেছে। বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন একটা জনগণের পকেট কাটার ডাকাতি কমিশনে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ছয়টি সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির মধ্যে পাঁচটিই লাভে।

এর মধ্যে লাভ করেছে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৩১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি ২৪৬ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ২৫৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ ১৩২ কোটি টাকা এবং বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড ৮৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকার বেশি মুনাফা করেছে। এই পাঁচ কোম্পানি গত তিন অর্থবছরেই লাভে ছিল। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ উৎপাদনে না গিয়ে গত অর্থবছরে ২৩ কোটি ২১ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে দাম বাড়ায়, গণশুনানি হচ্ছে লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। আমরা এই ধরণের গণশুনানিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি।

বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে ১১ শতাংশ সিস্টেম লস হয়, যদি ১ শতাংশ সিস্টেম লস কমানো যায় তাতে লাভ হয় ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা। একে আন্তর্জাতিক পযায়ে উন্নিত করতে পারলে আমাদের ১০ হাজার কোটি টাকা লাভ হতো।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের জনগণ এখন একটা সর্বগ্রাসী ডাকাতি ও চুরির খপ্পরে পড়ে আছে। সামনে নির্বাচন হবে ইতিমধ্যে তারা ভোট ডাকাতির ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা মূল্যবৃদ্ধির এই ডাকাতির টাকা দিয়ে নমিনেশন কিনবে, ভোট কিনবে, অস্ত্র-মাস্তান কিনবে, পুলিশ কিনবে, প্রশাসন কিনবে। সে টাকা কামানোর জন্য তেলের দাম, চালের দাম, চিনির দাম, বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়ায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য দাবি করে কিন্তু জনগণের পকেট সাফ করার সাফল্য দাবিটা করে না। নেতৃবৃন্দ বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অপচয় বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, জনগণের স্বার্থ না দেখতে পারলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের প্রয়োজন নেই। এটি এখন সরকারের আ[illegible] প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সমাবেশ শেষে [illegible] গুরুত্বপূর্ণ সড়[illegible]

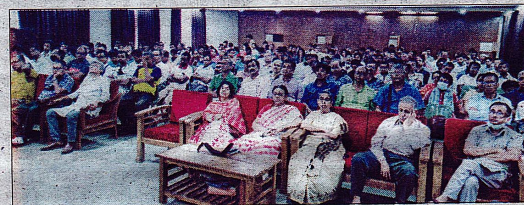
...ন রক্ষার ...ড় হয়ে উঠেছে। ...ন সাম্রাজ্যবাদীরা নাক ...ত তো আগে থেকেই থাবা বিস্তার

২ কলাম ১

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
● মে-জুন ২০২২
● ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২-২২৩৩৫২২০৬
● Website : www.vanguardonline.info

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঠিক উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ব করা বিপ্লবী পার্টির জন্য অপরিহার্য



কমরেড খালেকুজ্জামান

[১৫ ও ১৬ এপ্রিল '২২ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবিরে আলোচ্য বিষয় ছিল পার্টি প্রকাশিত *বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র* বই। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদক কমরেড নিখিল দাস, কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শম্পা বসু, কমরেড মনীষা চক্রবর্ত্তী, কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য কমরেড আল-কাদেরী জয়সহ অংশগ্রহণকারী কমরেডগণ। শিক্ষাশিবিরে কমরেড খালেকুজ্জামানের বৃক্তব্যের কিছু অংশ সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হলো।]

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা মানুষকে শিখিয়েছে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথেই শোষিতশ্রেণির মুক্তি আসবে। কালের বিবর্তনে সংগ্রামের রূপ পাল্টাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের আগে পর্যন্ত। তাই প্রকৃত মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম দরকার নির্দিষ্ট কালের শোষণের স্বরূপ এবং তার শ্রেণি ভিত্তিটি জানা। যে কোন লড়াই ও বিপ্লবের বিজয়ের জন্য বিরাজমান

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি রুখে দাঁড়াও

▫ চুরি, দুর্নীতি বন্ধ কর
▫ ভুল নীতি পরিত্যাগ কর

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বিদ্যুৎ-এর মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা বন্ধের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অযৌক্তিকভাবে বেশি খরচে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রেখে অহেতুক ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। সব রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বন্ধ করা হয়নি। বিদ্যুৎ এ দুর্নীতি, অপচয়, সিস্টেম লস দূর করা হয়নি।

এ অবস্থায় খরচ বেড়েছে বলে যে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে–তা অন্যায্য, অন্যায় ও অনৈতিক।

নেতৃবৃন্দ দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, অযৌক্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ব্যয়ের টাকা জনগণ দেবে না। পাশাপাশি নেতৃবৃন্দ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন অবসানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

২০ মে '২২ পল্টন মোড়ে বাম গণতান্ত্রিক

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩



খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়নের দাবি

মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র চলাচল করতে পারবে ব্যাটারিচালিত যান
সুপ্রিম কোর্টের রায় : আন্দোলনের বিজয়



রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ

১৩ এপ্রিল ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক যানবাহন মহাসড়ক ব্যতিত সর্বত্র চলাচলে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ প্রদানে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সমাবেশ ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক খালেখুজ্জামান লিপনের [illegible]ত্বে ও সদস্যসচিব প্রকৌশলী ইমরান [illegible] পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা রতন মিয়া, এস এম কাদির, শ্রমিকনেতা মেহেদী হাসান, তানভীর নাঈম, জালাল আহমেদ, দাউদ আলী মামুন, মো. মামুন ও রহমতউল্লাহ।

অবিলম্বে ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য প্রণীত খসড়া 'থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০২১ চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন, সড়ক-মহাসড়কে বিকল্প লেন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

তারা বাইরের [illegible]
পেরেছে। তাই জাল-জা[illegible]
এগুচ্ছে।

ঈদের দিনে বেকা গার্মেন্টস শ্রমিকদের অনশন
৩ মাসের বকেয়া বেতন-[illegible] পরিশোধের দাবি

আদমজী ইপিজেড এ অবস্থিত বেকা গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকরা ৩ মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বেনাস না পেয়ে ৩ মে ঈদের দিনে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করে। অনশন চলাকালে বক্তব্যে শ্রমিকরা পারিবার পরিজন নিয়ে ঈদ করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অনশন কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ কেন্দ্রীয় সম্পাদক কমরেড [illegible] দাস, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর কেন্দ্রীয় যুগ্মসমন্বয়ক আহসান হাবীব বুলবুল, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি অ্যাডভোকেট মন্টু ঘোষ, জেলা শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হাফিজুল ইসলাম, শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি আবু নাইম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১



[illegible]ান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
[illegible] সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২-২২৩৩৫২২০৬, ফ্যাক্স : ০২-২২৩৩৫১৩৩৫; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com

র মজুতদার-সিন্ডিকেটের সহযোগী ও রক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রক্ষক। ক্ষমতায় যেতে জনগণের ভোট প্রয়োজন হয়নি বলে সরকারের জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই।

তিনি বলেন, ঈদের আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, ঈদের পরে তেলের দাম বাড়ানো হবে। সরকারের এই ইঙ্গিত ব্যবসায়ী মজুতদারদের তেল মজুত করে বাজারে সংকট তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে। তিনি বলেন, সরকারের কাছে হিসাব আছে দেশে তেলের চাহিদা কত এবং কত টন আমদানি হয়েছে। তাহলে বাজারে তেলের সংকট হলো কীভাবে? আর ঈদের পর প্রথম কর্মদিবসেই তেলের দাম এক লাফে লিটার প্রতি ৩৮ থেকে ৪৪ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে রাতারাতি তেল ব্যবসায়ীদের পকেটে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঢুকানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে সরকার।

তিনি আরও বলেন, করোনায় সাধারণ মানুষ কর্ম হারিয়েছে, আয় কমেছে, অথচ সরকার নিম্ন আয়ের মানুষদের আয় বাড়ানোর কোন উদ্যোগ নেয়নি বরং সকল নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে জনগণের নাভিশ্বাস তুলেছে। ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধি মড়ার উপর খাড়ার ঘা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

কমরেড ফিরোজ ভোজ্য তেলের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার এবং খাদ্য পণ্যের রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়ে বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার জনগণকে ভয় পায় বলে ইভিএম দিয়ে ডিজিটাল ভোট জালিয়াতির উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি গণবিরোধী এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তেল নিয়ে ব্যবসায়ী বান্ধব সরকারের তেলেসমাতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়ছে চড়চড়িয়ে, ফলে দেশে তো ব্যবসায়ীরা বসে থাকতে পারে না। তাদের দরকার অজুহাত। যে কোন অজুহাতেই তারা দাম বাড়াতে পারেন। জনগণকে বোকা বানানোর স্বার্থে দেশে কোনো জিনিসের দাম বাড়ানোর কথা বলা যাবে না, তাই বলতে হয় মূল্য সমন্বয় করতে হবে। ভোক্তারা হাঁড়ে হাড়ে বোঝেন সমন্বয় কাকে বলে। তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়ে বাণিজ্য সচিবের সঙ্গে মিলমালিকরা বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে ভোক্তা অধিকার রক্ষার বিষয়ে যারা কাজ করছেন তাদের কোনো প্রতিনিধিকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি। বৈঠক শেষে ভোজ্য তেল পরিশোধন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয় এবং বিদ্যুৎ গতিতে সারা দেশে তা কার্যকর শুরু হয়েছে। একটা ছোট পরিবারে তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে মাসিক খরচ বেড়েছে ৪০০ টাকা, এক বছরে ৪ হাজার ৮০০ টাকা। আয় বেড়েছে কত?

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হয়, এখন থেকে বোতলজাত প্রতি লিটার সয়াবিন তেল খুচরাপর্যায়ে বিক্রি হবে ১৯৮ টাকায়, যার দাম ছিল ১৬০ টাকা। আর ৫ লিটারের বোতলের দাম হবে ৯৮৫ টাকা, যেটি ৭৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৮০ টাকা এবং খোলা পাম তেল প্রতি লিটার ১৭২ টাকায় বিক্রি হবে। ঘোষণা দেওয়ার আগে বাজারে খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৩৬ টাকা ও পাম তেল ১৩০ টাকায় বিক্রি হতো। এ হিসাবে খোলা সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে লিটারে ৪৪ টাকা। রোজার আগে বলা হয়েছিল রোজায় জিনিসের দাম বাড়বে না। সে কথা রাখেনি কেউ। কিন্তু আশঙ্কা ছিল ঘোষণা অনুযায়ী ঈদের পর দাম বাড়বে। কিন্তু এতটা বাড়বে তা নিশ্চয়ই ধারণা করেননি কেউ।

সরকারের পক্ষ থেকে রোজার আগে ভোজ্য তেল আমদানি, উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে দুই দফা মূল্য সংযোজন কর কমানো হয়েছিল, বাজারে তার প্রভাব তেমন পড়েনি কিন্তু সরকার হারিয়েছে রাজস্ব। গত ২০ মার্চ সরকার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ৮ টাকা কমিয়ে ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে। সে সময় খোলা সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ৭ টাকা কমিয়ে ১৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এরপর তেলের দামের এই দীর্ঘ লাফ। দেশের ভোজ্য তেলের বাজারে একসঙ্গে এত বেশি মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা এর আগে ঘটেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের বহু নতুন কীর্তির মতো এটিও একটি নতুন ও ব্যবসায়ী বান্ধব সাহসী পদক্ষেপ।

পাম অয়েলের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ ইন্দোনেশিয়া নিজের দেশের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে তেল রপ্তানিতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করলে ইন্দোনেশিয়া থেকে পাম তেল আমদানির সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে বিকল্প দেশ মালয়েশিয়া থেকেই আমদানি করতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত নিম্ন আয়ের মানুষ পাম অয়েলের প্রধান ক্রেতা। খোলা আকারে বিক্রি হয় এ তেল। হোটেল, রেস্তোরাঁয় খাবার তৈরিতে পাম তেল ব্যবহার হয় এ ছাড়া খাদ্যপণ্য ও প্রসাধনী তৈরির কোম্পানিগুলোও পাম তেল ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৩ লাখ টন পাম তেল আমদানি হয়। যার ৯০ শতাংশই আমদানি হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে। মালয়েশিয়া থেকে আমদানি হয় বাকি ১০ শতাংশ। মালয়েশিয়ার চেয়ে তুলনামূলক কম দামের কারণেই ইন্দোনেশিয়া থেকে বেশি পাম তেল আমদানি হতো। কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যবিষয়ক তথ্যের অন্যতম প্রধান উৎস যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে বিশ্বে পাম তেল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮১ লাখ টন। এই রপ্তানির ৫৬ শতাংশ বা ২ কোটি ৬৮ লাখ টনই করেছে ইন্দোনেশিয়া। মালয়েশিয়া রপ্তানি করেছে ১ কোটি ৫৮ লাখ টন, যা বৈশ্বিক রপ্তানির ৩৩ শতাংশ। বাকি ১১ শতাংশ রপ্তানি করেছে কয়েকটি দেশ মিলে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা বিশ্ব বাণিজ্যের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি করে। এর সুযোগ নিতে দেরি করেননি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা।

আমদানি কত হয় আর বাজারে কত সয়াবিন তেল মজুত আছে তার হিসাব মেলে না কিছুতেই। খুচরা বাজারে সবচেয়ে বেশি থাকার কথা বসুন্ধরা গ্রুপের সয়াবিন তেল। এরপর সিটি, মেঘনা, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল, টিকে ও সেনা কল্যাণ সংস্থার তেল। এই ছয় কোম্পানি এপ্রিল মাসের ১ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত আট কোটি লিটার সয়াবিন তেল বাজারজাত করেছে।

এই ছয়টিসহ দেশে এখন সাতটি কোম্পানি সয়াবিন তেল বাজারজাত করছে। বাজারজাতকরণে কোনো মাসে এক কোম্পানি শীর্ষে তো অন্য মাসে আরেক কোম্পানি শীর্ষে ক্রমতালিকায় এমন উত্থান-পতনে এপ্রিল মাসে সয়াবিন তেল বাজারজাতে শীর্ষে ছিল বসুন্ধরা গ্রুপ। এই বাজারজাত করা সয়াবিন তেল ডিলারদের হাত ঘুরে খুচরা বাজারে আসার কথা। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, সয়াবিন তেল আমদানি করে প্রথমে জাহাজ থেকে কর্ণফুলী নদীর তীরে কাস্টমস বন্ডেড ট্যাংক টার্মিনালে রাখা হবে। সেখান থেকে পরিশোধন করে বাজারজাত করার জন্য শুল্ক কর পরিশোধ করে খালাস করে নিয়ে যাবে কোম্পানিগুলো।

তথ্যানুসারে, এপ্রিল মাসের ২৮ দিনে বসুন্ধরা গ্রুপ পরিশোধন করে বাজারজাত করেছে সোয়া তিন কোটি লিটার সয়াবিন তেল, যা গত মাসে বাজারজাত হওয়া মোট সয়াবিনের ৩৯ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সিটি গ্রুপ বাজারজাত করেছে ১ কোটি ৪৩ লাখ লিটার সয়াবিন তেল। তৃতীয় অবস্থানে থাকা মেঘনা গ্রুপ ১ কোটি ৩০ লাখ লিটার, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল ৮৮ লাখ লিটার, টিকে গ্রুপ ৮৭ লাখ লিটার ও সেনা কল্যাণ এডিবল অয়েল ৫৪ লাখ লিটার সয়াবিন তেল বাজারজাত করেছে। এ হিসেবে ৮ কোটি ১৮ লাখ লিটার বা ৮১ হাজার ৮০০ টন তেল বাজারে থাকার কথা। কিন্তু বাজার থেকে তেল উধাও! তেল নাই, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তেল।

ঈদের আগে কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অভিযানে নেমে দেখেছে তেল আছে। তবে দোকানে নয় পরিবেশকের গুদামে। এই অভিযানের ফলে ঈদের আগে বাজারে কিছু পরিমাণ তেল এসেছিল। কিন্তু ক্রেতাদের দু-এক দিন দেখা দিয়ে আবার তা উধাও হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পর বাজারে ফিরবে তেল আবার। এর আগে খবর এসেছিল এমভি ওরিয়েন্ট চ্যালেঞ্জ নামে একটি জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে ২ কোটি ২৯ লাখ লিটার অপরিশোধিত সয়াবিন তেল নিয়ে গত ২৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে। অন্যদিকে ১৩ হাজার টন পাম অয়েলবাহী ইন্দোনেশিয়ান জাহাজ এমটি সুমাত্রা ৬ মে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই তেল বাজারে আসার আগেই তো দেশে দাম বাড়ানো হলো আর তেল কেনা হয়েছে বিশ্ববাজারে আগের দামে। বাজারে এই তেল কী আগের দামে বিক্রি হলো? নিশ্চয়ই নয়, বিক্রি হচ্ছে বাড়িয়ে দেওয়া দামে। লিটারপ্রতি ৩৮ টাকা বৃদ্ধি ধরলে ২ কোটি ২৯ লাখ সয়াবিন আর ১ কোটি ৩০ লাখ টন পাম অয়েল মোট ৩ কোটি ৫৯ লাখ লিটার। দাম বৃদ্ধির ঘোষণার ফলে মুনাফা বৃদ্ধি ১৩৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা। কারণটা না দেখে অনেকেই বলবেন কী কপাল! তেল বন্দরে এলো আর দাম বৃদ্ধির ঘোষণাও হলো। ব্যাপার কী তা হলে এই যে, ব্যবসায়ীদের কপালে মুনাফা থাকলে ঠেকায় কে? নাকি সরকারের নেক নজর আর ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় মুনাফা আকাশ ছোঁয়া হয়। ভোক্তার ভাগ্যে দুর্ভোগ ছাড়া অন্য কিছু বরাদ্দ করতে নারাজ ব্যবসায়ী বান্ধব সরকার? এ পরিস্থিতিতে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই নতুন নতুন পরামর্শ আসবে। তেল খাওয়া কমানো কিংবা তেলবিহীন রান্নার কথা তো হরহামেশাই শোনা যাচ্ছে।

বিশ্ববাজারে কত বেড়েছে তেলের দাম, তার প্রভাব দেশের বাজারে কতখানি পড়বে তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। গত বছর মে মাসে বিশ্ব বাজারে সয়াবিন তেল ছিল ১ হাজার ৫৬৮.৬৫ ডলার প্রতি টন। এ বছর ১০ মে দাম ছিল ১ হাজার ৯২১.৯৯ ডলার। অর্থাৎ দাম বৃদ্ধির হার ২২.৫২ শতাংশ। কিন্তু দেশে গতবছর ছিল ১১৮ টাকা লিটার, এই বছর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৮ টাকা লিটার। গত বছরের তুলনায় প্রতি লিটারের দাম বৃদ্ধি ৮০ টাকা অর্থাৎ বৃদ্ধি ৬৭.৭৯ শতাংশ!

সরকার টিসিবির মাধ্যমে বাজার থেকে তেল কিনে বাজারে কম দামে বিক্রি করলে সমাধান হবে না। সরকার কি ফিউচার ট্রেডিং করতে পারে, কিংবা তেলের বাফার স্টক গড়ে তুলতে পারে? জনগণকে একটু স্বস্তি দিতে সরকার কোনো কী পদক্ষেপ নেবে, নাকি বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে জনগণের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণের পুরনো পথেই হাঁটবে? ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত হয়েছে দাম বাড়ানোর। সর্বংসহা জনগণ মেনে নিন, কোনো প্রতিবাদ বা ঝামেলা করবেন না। বিভিন্ন অজুহাতে তেলের দাম বাড়ছে, জনগণের কষ্ট বাড়ছে, দাম বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়তে থাকবে। এই দাম ও কষ্ট বৃদ্ধির চক্কর থেকে জনগণের কী কোনো রেহাই নেই? যুদ্ধের অজুহাত, বেশি খাওয়ার অপবাদ, আয় বৃদ্ধির হিসাবনিকাশ, প্রতিবাদকে ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্র বলে সমস্যাকে এড়িয়ে গেলে সমাধান কি আসবে? জনগণের আয় বৃদ্ধির পথ খোলা নেই তাই মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হতেই থাকবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী তেলের সংকটের জন্য ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের দায়ী করেছেন। তাদের বিশ্বাস করে ভুল করেছেন, আবার ভোক্তারা বেশি কিনছে বলেও তাদের দোষারোপ করেছেন। যতদিন এই সমস্ত ব্যবসায়ী বান্ধব দল-নেতা, মন্ত্রীরা দায়ীত্বহীনভাবে ক্ষমতা দখল করে থাকবে তত দিন মূল্যবৃদ্ধির আঘাত জনগণকেই ভুগতে হবে। তাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

জাল-জালিয়াতির নব কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে ছিল। এবার চীনও হিসাব কষছে। শাসকদের সম্পদ ও জীবন রক্ষা আর প্রধান বিরোধী শক্তির সাংগঠনিক অস্তিত্ব রক্ষার সংকটজালে এরা দেশবাসীকে আটকে রাখতে চাইছে। শাসক দল এককভাবে ক্ষমতার সবটুকু ভাগ-ভোগ নিয়ে আর চলতে পারবে না। এটা তারা বাইরের চাপে ও দেশের উত্তাপে বুঝতে পেরেছে। তাই জাল-জালিয়াতির নব কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে।

উন্নয়ন কাজে মেগা প্রজেক্টের মেগা লুট, পদ-পদবির বিস্তার, নানা সম্মানী ও জাতীয় পুরস্কারাদি বিলি-বণ্টন, আমলা-প্রশাসনে পুলিশের পদ ছাড়া ইনসিটু পদায়ন (আগের পদে পুনর্বহাল), ব্যাংক, মিডিয়াসহ নানা প্রতিষ্ঠান ও উপঢৌকন দেয়ার উসুল আদায়, শাসকদের ঝুঁকির সাথে শাসন-প্রশাসন কর্মমর্তাদের ঝুঁকিকে এক কাতারে নিয়ে আসা হয়েছে।

ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে বাইরে ধমক, লোক দেখানো তৎপতা আর ভিতরে আশ্বস্ত রাখা, বিদেশি শক্তিকে তুষ্ট রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, চোর-ডাকাতের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ, বাচাল বিতর্কে আসর মাতিয়ে সুস্থ জনমত গড়ে উঠতে না দেয়া ইত্যাদি চলছে।

উদ্দেশ্য হাসিলের অনুসঙ্গ হিসাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা ও পরিচালনায় বুর্জোয়াশ্রেণির কোন অংশ কত দক্ষ, কত তৎপর, অনুগত সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতি লুটেরাশ্রেণির কাছে কে কতোটা গ্রহণযোগ্য-এ হিসাবের বাইরে জনগণকে বেরিয়ে আসতে হবে। বুর্জোয়াশ্রেণির ধনবাদী স্বার্থ চেতনার বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা শোষণমুক্তির সমাজতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আসন ভাগাভাগি, গদি নিয়ে কাড়াকাড়ির বদলে শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সংগ্রাম গড়ে তুলতে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির পেছনে কাতারবন্দি হওয়া আজ সময়ের দাবি।

বাসদ এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণের সংগ্রাম নিরলনভাবে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। আসুন এ সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও অসংখ্য শহিদের ও সংগামী জনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।

বাসদ ফেনী জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত



মালেক মনসুর আহ্বায়ক অর্জুন দাস সদস্যসচিব নির্বাচিত

গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্রতর করুন পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসার স্লোগানকে উপজীব্য করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ফেনী জেলা শাখার সম্মেলন ১৩ মে শহরের মডেল থানার সামনে সোনালী মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় বাসদ জেলা কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়ে। বাসদ ফেনী জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড হারাধন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব কমরেড মালেক মনসুরের পরিচালনায় সম্মেলনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড নিখিল দাস, জেলার নেতা অর্জুন দাস, সিরাজ উদ্দিন, সিপিবি জেলার সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন স্বপন ও শ্রমিক নেতা প্রদীপ দাস। সম্মেলন শুরুতে লাল পতাকার একটি সুদৃশ্য র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

সম্মেলনে কমরেড মালেক মনসুরকে আহ্বায়ক এবং কমরেড অর্জুন দাসকে সদস্যসচিব করে সাত সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

সম্মেলন শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা।

আমেরিকার নেতৃত্বে আই.পি.এস-এ যুক্ত হওয়া এবং সমরাস্ত্র কেনার তৎপরতা বন্ধ করুন

বাসদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৮ এপ্রিল '২২ সংবাদপত্রে দেয়া একবিবৃতিতে প্রশান্ত-ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বাড়ানোর অংশ হিসেবে ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আই.পি.এস) জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে ঝুকিপুর্ণ বিবেচনা করে এ উদ্যোগ থেকে সরে আসার আহবান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, মার্কিনী স্বার্থে ভূরাজনৈতিক সামরিক কোন জোটে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক। এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অস্ত্র কেনার প্রস্তাব গ্রহণ না করে দেশের কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানো ও মনোযোগ দেয়ার দাবি জানা তিনি।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, দুর্নীতি, গণতন্ত্রহীনতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, কর্মহীনতা, ন্যায্য মজুরি না পাওয়া, কৃষকের দুর্দশা দেশের সামনে প্রধান সমস্যা। এগুলো সমাধানে উদ্যোগ নেয়া অস্ত্র কেনার চাইতে বেশি জরুরি। মার্কিন যুদ্ধ জোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মার্কিনীদের সহায়তা পেতে চাইছে। এর ফলাফল দেশের নিরাপত্তাতো বাড়াবেই না বরং মার্কিনীদের যুদ্ধ চক্রান্তের অংশ হয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ। এই অশুভ তৎপরতা বন্ধ করার জোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বাসদ ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

অধ্যক্ষ মোসায়েদ হোসেন ঢালী আহ্বায়ক, সৈয়দ আলী মোল্লা সদস্যসচিব নির্বাচিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ফরিদপুর-গোপালগঞ্জ জোন-৭ এর কাউন্সিল ১৭ মে '২২ জোনের সমন্বয়ক কমরেড মোসায়েদ হোসেন ঢালীর সভাপতিত্বে বাটিকামারী প্রভাতিনূর কিন্ডারগার্টেনে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জুলফিকার আলীসহ পার্টির স্থানীয় কাউন্সিলরবৃন্দ। সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট, এবং শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা, সাংগঠনিক কাজের মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড মোসায়েদ হোসেন ঢালীকে আহ্বায়ক ও কমরেড সৈয়দ আলী মোল্লাকে সদস্যসচিব করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি নির্বাচিত করা হয়।



১২ শ টাকা মণ দরে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার আহ্বান

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৮ এপ্রিল '২২ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে চলতি বোরো মৌসুমে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ ও প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটি সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে লাভজনক দামে অর্থাৎ অর্থাৎ ১২০০ টাকা মণ দরে উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বোরো মৌসুমে ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে ১৮ লাখ মেট্রিক টন। দাম নির্ধারণ করেছে ধান ২৭ টাকা কেজি এবং সিদ্ধ চাল ৪০ টাকা কেজি, আতপ চাল ৩৯ টাকা কেজি। সরকার কৃষকের কাছ থেকে ধান কম কিনে চাল বেশি অর্থাৎ ৬ লাখ ৫০ হাজার টন ধান, ১১ লাখ টন সিদ্ধ চাল ও ৫০ হাজার টন আতপ চাল ৩১ আগস্ট '২২ এর মধ্যে কেনার ঘোষণা দিয়েছে। অথচ কৃষক উৎপাদন করে ধান, আর চাতাল মালিক উৎপদান করে চাল। সরকার এই দুই উৎপাদককে একাকার করে দিয়ে দেশবাসীকে ধোকা দিচ্ছে ও প্রতারণা করছে। চাতাল মালিক সিন্ডিকেটকে সহায়তা করতেই সরকার ধান কম কিনে চাল বেশি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ চাল ক্রয় না করে উৎপাদক কৃষকের কাছ থেকে ৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের দাবি জানান। একই সাথে কৃষকের যাতে লোকসান না হয় সেজন্য ২৭ টাকা নয় কমপক্ষে ৩০ টাকা কেজি দরে লাভজনক দাম নিশ্চিত করে অর্থাৎ মণপ্রতি কমপক্ষে ১২০০ টাকা দরে ধান ক্রয়ের দাবি করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাজারে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ থাকা বাঞ্ছনীয় ফলে মৌসুমে ৫০ লক্ষ টন ধান ক্রয় করে পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তুলে বাজার স্থিতিশীল রাখার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ উৎপাদক কৃষক ও ভোক্তা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় উপরোক্ত দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ, মাগুরা

বিজ্ঞান হোক সকল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ মে মাগুরা সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে 'বিজ্ঞান উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ছিল বাঙালি বিজ্ঞানীদের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানবিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, টেলিস্কোপ দেখা-জানা ও পুরস্কার বিতরণী। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও জামাল নজরুল ইসলাম এই পাঁচ বাঙালি বিজ্ঞানীর জীবন, কর্ম ও আবিষ্কার বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, বিজ্ঞান শিক্ষক রুহুল আমিন, সাবেক অধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, তেল-গ্যাস, খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি জেলার সদস্যসচিব শরীফ তেহরান টুটুল, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সংগঠক শোভন রহমান, মাগুরা জেলা সংগঠক মো. সোহেল মুন্সী। সভা পরিচালনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ-মাগুরা জেলা শাখার সংগঠক নাফিসা নাওয়ার নিঝুম।



নরসিংদীতে তরুণী লাঞ্ছনার বিচার দাবি



২৩ মে প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নরসিংদীতে তরুণী লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাকসুদা আক্তার লাইলী, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের রুখশানা আফরোজ আশা, নারীমুক্তি কেন্দ্রের তৌফিকা লিজা, বিপ্লবী নারী ফোরামের আমেনা বেগম, গার্মেন্ট ঐক্য ফ্রন্টের শবনম ফেরদৌসী।

২০ মে : চা-শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরি আদায়ে লড়াইয়ের অঙ্গীকার

জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারের বিচারে পৃথিবীতে যেমন, বাংলাদেশেও পানির পরেই চায়ের অবস্থান। কিন্তু এই সুপ্রিয় পানিয় উৎপাদন ক্ষেত্র মনোরম চা বাগানের সুন্দর পরিবেশ, সবুজ চা গাছের আড়ালে চাপা পড়ে আছে চা-শ্রমিকদের জীর্ণ-শীর্ণ করুণ চেহারা ও দীর্ঘশ্বাস। ১৮৫৪ সালে মালিনীছড়া চা বাগানের মাধ্যমে এই অঞ্চলে চা চাষের শুরু। 'গাছ হিলায়গা তো প্যায়সা মিলেগা' এই প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দখলদার ব্রিটিশ শাসকরা তৎকালীন ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বৃহত্তর আসাম ও সিলেটে চা বাগান গড়ে তোলার জন্য হাজার-হাজার অনগ্রসর মানুষকে নিয়ে আসে। বছরের পর বছর জঙ্গল পরিষ্কার করে, হিংস্র পশুর আক্রমণে জীবন দিয়ে, জোঁক ও মশার কামড় খেয়ে চা বাগান ও চা শিল্প গড়ে তুলেছিল এই চা শ্রমিকরা। সুন্দর ও মানবিক জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজেদের ভিটে-মাটি ত্যাগ করে চা বাগানে কাজ করতে এলেও চা শ্রমিকরা মুখোমুখী হন নির্মম শোষণ-বঞ্চনা, প্রতারণা ও নির্যাতনের। চা বাগান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ মালিকরা চা-শ্রমিকদেরকে আক্ষরিক অর্থেই ঘেরাটোপে বন্দি এক দাসত্বের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাঁরা গাছ হিলালো, কিন্তু ন্যায্য মজুরি পাওয়ার বদলে পেল দাসত্বের জীবন। প্রায় শত বছরের বঞ্চনা, নিপিড়ন আর অপমানের বিরুদ্ধে চা-শ্রমিক নেতা পণ্ডিত গঙ্গাচরণ দিক্ষিত এবং পণ্ডিত দেওসরন জবরদস্তিমূলক দাসত্বে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 'মুলুক চলো' আন্দোলনের ডাক দেন। তাদের আহবানে ৫ মে ১৯২১ সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলি থেকে হাজার-হাজার শ্রমিক বের হয়ে আসতে থাকে। নিজদেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা পায়ে হেঁটে ১৯২১ সালের ২০ মে চাঁদপুরে মেঘনা স্টিমার ঘাটে পৌছায়। আতঙ্ক তৌরী করে এই শ্রমিকদের চা বাগানে ফিরিয়ে নিতে ব্রিটিশ সৈনরা সেখানে গুলি করে হত্যা করে অসংখ্য চা-শ্রমিককে এবং বেয়নেট দিয়ে পেট কেটে তাদের লাশ মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তাই ২০ মে বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের জীবনে শোক, সংগ্রাম এবং প্রতিক্ষার দিন। অধিকার বঞ্চিত চা-শ্রমিকদের অধিকার মর্যদা ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে রুখে দাঁড়ানোর দিন ২০ মে। প্রায় ১০ লক্ষাধিক চা জনগোষ্ঠীর কাছে শোক এবং বিদ্রোহের এই দিনটিকে স্মরণ করিয়ে চা-শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার আদায়ে জাগরণ সৃষ্টির জন্য 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন' ২০০৮ সাল থেকে এই দিনটিকে 'চা-শ্রমিক শোক দিবস' হিসাবে পালন করতে শুরু করে এবং চা-শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক ২০ মে 'চা-শ্রমিক দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়ে প্রতিবছর এই দিনটি পালন করে আসছে।

বাংলাদেশে চা উৎপাদন বাড়ছে, ২০২১ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি চা উৎপাদন হয়েছে, চায়ের দাম বেড়েছে, মালিকের মুনাফা বেড়েছে; বিপরীতে বেড়েছে শ্রমিকের বঞ্চনা, শ্রম শোষণ, কমছে মজুরি, কমছে কর্মসংস্থান। চা বাগানের সূচনালগ্ন থেকেই যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রিটিশ মালিকরা বাগান পরিচালনা করত বর্তমানেও তার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বাজার দরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মজুরি থেকে চা-শ্রমিকরা আজও বঞ্চিত। উন্নত আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসার নামে চলছে প্রহসন। বিশুদ্ধ পানি, উন্নত পয়ঃপ্রণালি, মানসম্মত রেশন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ কোন কিছুরই সন্তোষজনক আয়োজন নেই। বংশ পরম্পরায় চা বাগানে বসবাস করলেও নেই ভূমির অধিকার।

স্বাধীন বাংলাদেশেও চা-শ্রমিকরা বারংবার শুধু ভোট ব্যাংক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সরকারি উদ্যোগ বাণিজ্যের প্রসারে যতটুকু মনোযোগী, চা-শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নে ততটুকু নয়। আর শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত চা-শ্রমিক ইউনিয়নের আপসকামী, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা ব্যস্ত। ১-২ টাকা দ্বিবার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি করে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির নামে চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার কৌশল বন্ধ করতে 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন' চা-শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করার দাবি তোলে। দাবির মুখে ২০০৯ সালে চা-শ্রমিকদের জন্য প্রথম মজুরি বোর্ড গঠিত হয় এবং একবারে ১৯ টাকা মজুরি বৃদ্ধির নজির তৈরী হয়। নির্দিষ্ট ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিপক্ষিক চুক্তিতে ন্যায্য মজুরি আদায়ে ব্যর্থ হয়েও চা-শ্রমিক ইউনিয়ন নতুন মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি জানায়নি। বরং মজুরি বোর্ড গঠন করে চা-শ্রমিকদের নগদ মজুরি ৫০০ টাকা ঘোষণার দাবিতে চা-শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে ২০১৯ সালে নতুন মজুরি বোর্ড গঠিত হলে মজুরি বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নতুন মজুরি প্রস্তাব করতে শ্রমিকদের মতামত নেয়নি, বোর্ডের উপর চাপ তৈরি করতে শ্রমিকদের যুক্ত করার পরিবর্তে 'মজুরি বোর্ড' গঠনের সংবাদ দীর্ঘদিন শ্রমিকদের কাছে গোপন রাখে। পরবর্তীতে মজুরি বোর্ডকে অকার্যকর করতে মজুরি বোর্ডের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ১২০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। শ্রমিক সদস্যদের আপসমূলক অবস্থানের প্রেক্ষিতে মজুরি বোর্ডও দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে চা-শ্রমিকদের দৈনিক ১২০ টাকা মজুরির খসড়া প্রকাশ করে। চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি আদায়ে ইউনিয়নের নেতৃত্বের এই নিষ্ক্রিয়তা শুধু তাদের যোগ্যতা নয়, তাদের সততাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। যৌথ দরকষাকষির প্রাথমিক শর্ত হলো বিদ্যমান আইনে উল্লেখিত সুবিধার চেয়ে বেশি আদায় করা। 'চা শ্রমিক ইউনিয়ন' আর 'চা সংসদ'-এর মধ্যে প্রতি দুই বছরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনো চা-শ্রমিকরা শ্রম বিধিমালা-২০১৫-এর পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আইনে থাকলেও শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তা বাস্তবায়ন করেনি। চা-শ্রমিক ইউনিয়নকেও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়ন কিংবা শ্রম আইনের চা-শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ বিধানসমূহ সংশোধনের দাবিতে আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। শ্রেণি ও অধিকার সচেতনতা ছাড়া গোষ্ঠী নেতৃত্ব যে অধিকার আদায় করতে পারবে না, চা-শ্রমিক ইউনিয়ন-এর নেতৃত্বের ভূমিকা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

সস্তায় চা উৎপাদনের জন্য চা-শ্রমিকদের নিজেদের ভিটা-মাটি, সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে চা বাগানের গণ্ডির মধ্যে ক্রিতদাসের জীবনে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। প্রায় ১৭০ বছর পরে আজও ভূমির অধিকারের স্বীকৃতি নাদিয়ে তাদের উদ্বাস্তু করে, অধিকাংশকে বেকার রেখে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে, স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে চা-শ্রমিকদের আধুনিক ক্রিতদাস রূপে আটকে রাখা হয়েছে। ১২০ টাকা মজুরি পেতে একজন চা শ্রমিককে কমপক্ষে ২৩ থেকে ২৫ কেজি কাঁচা পাতা বুঝিয়ে দিতে হয়। নানা অজুহাতে কর্তন আর চুরির পরে ২৩ কেজি পাতা বুঝিয়ে দিতে শ্রমিকদের তুলতে হয় আরও বেশি। ৪ কেজি চা পাতা থেকে তৈরি হয় এক কেজি চা, অর্থাৎ একজন চা-শ্রমিক ১২০ টাকা মজুরি পেতে উৎপাদন করে প্রায় ৬ কেজি চা যার বাজার মূল্য কমপক্ষে দুই হাজার টাকা।

চা বোর্ডের হিসাব মতে স্থায়ী চা-শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১৯ হাজার আর অনিয়মিত শ্রমিক ২৫ হাজার। ২ লক্ষাধিক শ্রমিক বছরের পর বছর দিন মজুর হিসাবে কাজ করে। রেশন, আবাসন, চিকিৎসা, উৎসব বোনাসের যে ন্যূনতম সুবিধা আছে তা থেকে বঞ্চিত করতে এই শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয় না। চা বাগানগুলিতে শ্রম আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য শ্রম পরিদর্শন দপ্তরের কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অনগ্রসর চা জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে তাদের ন্যায্য মজুরি, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, শিশুদের শিক্ষাবৃত্তি, সরকারি চাকরিতে কোটার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই অধিকারসমূহ আদায় করতে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চা-শ্রমিকদের ২০ মে'র বিদ্রোহের চেতনাকে ধারণ করতে হবে। চুক্তি-চুক্তি খেলার মধ্যে সময়ক্ষেপণ করে চা-শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমানো, শ্রমিকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের ন্যায্য দাবিসমূহকে আড়াল করার কৌশল উম্মোচিত করতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণির চেতনা ধারণকারী নেতৃত্বকে বেছে নিয়ে আপসকামী ইউনিয়নের বিপরীতে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে–

- ২০ মে কে 'চা শ্রমিক দিবস' হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে চা-শ্রমিকদের জন্য ছুটি ঘোষণা কর।
- অবিলম্বে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম নগদ মজুরি দৈনিক ৫০০ টাকা নির্ধারণ কর, তিন মাসের অধিক সময় কর্মরতদের স্থায়ী নিয়োগ দাও। নিরিখের অতিরিক্ত কাঁচাপাতার উৎপাদনে এবং ছুটির দিনে কাজ করার জন্য দ্বিগুণ হারে মজুরি দাও।
- শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধি অংশ সংশোধন কর, চা-শ্রমিকদের জন্য গ্রাচুয়িটি, মুনাফায় অংশগ্রহণ, স্থায়ী আবাসনের অধিকার নিশ্চিত কর, শ্রম বিধিমালার ৫ম তফসিল বাস্তবায়ন কর।
- সমাজ সেবা অধিদপ্তরের চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে চা জনগোষ্ঠীর প্রতিটি পরিবারকে যুক্ত কর। অবসরপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের পেনসন ও রেশন দিতে হবে।
- প্রতিটি বাগানে পুর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, স্কুল, শিশুযত্ন কেন্দ্র চালু কর। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস নির্ধারণ কর। চা-শ্রমিক সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি চাকরিতে কোটা ও শিক্ষা ভাতার ব্যবস্থা কর।
- চা-শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত কর। চাকরির অবসানে চা-শ্রমিকদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।
- রেশন হিসেবে সপ্তাহে শ্রমিক প্রতি ৫ কেজি এবং নির্ভরশীল প্রতি জনে ৩ কেজি চাল ও প্রতি মাসে ২ কেজি চা পাতা দিতে হবে। চাষাবাদের জমির বিপরীতে রেশন কর্তন করা যাবে না।

ব্যবসায়ীরা কথা না রাখলেও সরকার ব্যবসায়ীদের কথা রেখেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জোট ১৭ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে যায়। মিছিল জিরো পয়েন্ট হয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অভিমুখে গেলে পুলিশি ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। এ সময় পুলিশ বাম জোটের নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জে বাম জোটের অনেক নেতা-কর্মী আহত হন।

জোটের সমন্বায়ক বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদে সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নজরুল ইসলাম।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, ব্যবসায়ীরা কথা রাখেনি, অথচ ঈদের পর প্রথম কর্মদিবসে সরকার ব্যবসায়ীদের দেওয়া কথা রেখেছে। তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তেল মজুত, ঠিকমত সরবরাহ ও নির্ধারিত দামে বিক্রি করার জন্য যেখানে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সেখানে দাম বাড়িয়ে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষা করছে। নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ বাণিজ্যমন্ত্রীর অপসারণ ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসানে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিকল্প বাজার ব্যবস্থা ছাড়া ব্যবসায়ীদের সাথে অনুনয়-বিনয় করে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এটা দয়া-দাক্ষিণ্যে ব্যাপার নয়। এজন্য দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে তেলসহ নিত্যপণ্য আমদানি, মজুত গড়ে তোলা এবং সারাদেশে সার্বজনীন রেশনিং ও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়ে টিসিবি'র গাড়ি চালুর কথা বলে আবার তা বন্ধ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জনগণকে ধোকা দিয়ে এটার মাধ্যমে সরকার সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করলেন।

নেতৃবৃন্দ দুর্নীতিমুক্তভাবে ফ্যামিলি কার্ডের সংখ্যা অন্তত তিন কোটি, পণ্যের সংখ্যা বাড়ানো ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পৌছানোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের দুঃশাসনের অবসানের আন্দোলনের সাথে বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম জোরদার করবে বাম জোট।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নীতিনিষ্ঠ অবস্থানে থেকে বাম জোট তার আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। এসব দাবিতে অন্যান্য শক্তিকে মাঠে নামার আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, যার যার অবস্থান থেকে রাজপথে নামুন–আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশসনের অবসান ঘটান।

জিরো পয়েন্টের মোড়ে পুলিশি বাধা ও লাঠিচার্জের পরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার পুলিশি আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, হামলা করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। সারাদেশে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

বাম জোটের আহ্বানে একই দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশে হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা : গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্র নীতি, ঋণনির্ভর অর্থনীতি—উন্নয়নের বেলুন ফুটো

শ্রীলঙ্কার রাস্তায় জনতার ঢল। বিক্ষুব্ধ মানুষের মিছিল চলছে। রাস্তায় পুলিশের গুলিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, মানুষের হাতে মন্ত্রী-এমপিরা হেনস্তার শিকার হচ্ছে। পুরো পৃথিবী তাকিয়ে আছে শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভের দিকে। জনবিক্ষোভের এই বিস্ফোরণের মূল কারণ হচ্ছে জনদুর্ভোগ। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট থাকায় পেট্রোল, ডিজেল, এলপিগ্যাস, খাদ্যপণ্য, ওষুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি ব্যাহত হয়েছে। কার্যত পুরো দেশটা অচল ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। গত এক বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। জনগণকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। জ্বালানি সংকটের কারণে প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুতের লোডশেডিং হচ্ছে। কাগজের অভাবে স্কুল-কলেজে পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার মতো নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। সেখানকার বিক্ষুব্ধ জনতা রাজাপক্ষ সরকারের পদত্যাগ চাইছে, চাইছে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি। দেশের অবস্থা অবনতির শেষ পর্যায় দিয়ে এখন অচল হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কেন তৈরি হল এই সংকট?

এই সংকট একদিনে তৈরি হয়নি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক বিস্ফোরণ ঘটেছে এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। বহুদিন থেকেই শ্রীলঙ্কায় নব্য উদারপন্থী অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র, আমদানি ও ঋণনির্ভর অর্থনীতিসহ আরও বহু বিষয়। এই সংকটকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় কারণ আমাদের দেশসহ অনেক দেশের শাসকদের গৃহীত বহু নীতির সাথে শ্রীলঙ্কার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ঋণনির্ভর অর্থনীতি

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১৯৭৭ সাল থেকেই শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারায় হাঁটতে শুরু করেছে। জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার বদলে আমদানিনির্ভর ও বাণিজ্যঘাটতির অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সালে বিদেশি ঋণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কার ঋণ ছিল ১৯.৪৫ বিলিয়ন যা ২০১৯ সালে বেড়ে ৩৮.৭ বিলিয়ন হয়েছে। শ্রীলঙ্কার এই ঋণ দেশটির মোট জিডিপির (৮৪ বিলিয়ন) ৪২%। এত ঋণ থাকার পরও শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় ১১ হাজার ৬৮ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের ৫ গুণেরও বেশি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, শুধু মাথাপিছু আয়ের ফাঁকা বুলি আওড়ালেই অর্থনীতির উন্নয়ন বুঝায় না।

শ্রীলঙ্কার ঋণের তুলনামূলক চিত্র

বাণিজ্যিক ঋণ–৪৭%
বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক–২২ % (এডিবি- ১৩%, বিশ্বব্যাংক–৯%)
জাপান–১০%
চীন-১০%
ভারত–২%
অন্যান্য–৯%

সম্প্রতি ইন্সটিটিউট অফ পলিসি স্টাডিস অফ শ্রীলঙ্কার নির্বাহী পরিচালক ডুশনি বিরাকুন বলেন, 'কীভাবে ঋণ শোধ করা হবে তা নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামিয়ে সরকার একের পর এক বন্ড ইস্যু করে গেছে। এক্ষেত্রে পণ্য ও সেবার রপ্তানি থেকে আয় না করে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলা হয়েছিল ধার করে।' ২০২১ সালের শেষ নাগাদ জাতীয় ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দেয়। কারণ দেশের বৈদেশিক রিজার্ভ ১৬০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। অথচ শুধু ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কাকে ৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও ১ বিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক বন্ড (আই এস বি) পরিশোধ করতে হবে। শ্রীলঙ্কা সর্বশেষ ২০২২-এর ১২ এপ্রিল সকল বিদেশি ঋণ পরিশোধে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছে।

পশ্চিমা অনেক গণমাধ্যম শ্রীলঙ্কার এই সংকটের জন্য চীনের ঋণকেই প্রধান কারণ হিসেবে দেখাতে চান ও দায়ী করতে চান। অথচ বিশ্বব্যাংক ও এডিবির ঋণ চীনের থেকে বেশি, জাপানের ঋণ চীনের সমান। চীনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের লালিত দীর্ঘদিনের সুদের কারবারের ইতিহাস ও পুঁজিবাদের অনিবার্য সংকট ও সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশি গ্রাসী আড়াল করতে চায়।

উন্নয়নের ফাঁপা বেলুন

আয় কমে গেলেও বা ঋণে জর্জরিত হলেও মেগাপ্রজেক্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজাপাকশে সরকারের আগ্রহের ঘাটতি ছিল না। এইসব প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় দামি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে প্রয়োজন হয়েছে প্রচুর ডলারের। ধার করে ঘি খাওয়া প্রবাদের মতো রাজাপাকশে সরকার উন্নয়নের নজির দেখাতে গিয়ে একের পর এক ঋণনির্ভর অবকাঠামো নির্মাণের দিকে ঝুঁকে দেশের অর্থনীতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। সানডে টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রীলঙ্কা একটি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র যার উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪৪০ কিমি ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বোচ্চ দূরত্ব ২২০ কিমি। ১৯ শতকে ব্রিটিশ আমল থেকেই শ্রীলঙ্কায় রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। ৫ ঘণ্টার মধ্যে সড়কপথে দেশটির যেকোন জায়গায় পৌঁছানো যায়। তবুও একের পর এক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজনের চেয়ে প্রদর্শনের ঝোঁক থেকে করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। বিশ্বব্যাংকের ২০০০ সালের এক পর্যবেক্ষণে বলা হয় যে ১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে ১০ লাখ থেকে ২১ লাখ মার্কিন ডলার সর্বোচ্চ খরচ হতে পারে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে এই হিসাবের চেয়ে ১.৭ থেকে ১১ গুণ অর্থ বেশি খরচ হয়েছে। হামবানতোতা শহরে রাজাপাকশে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করেছে। ফোর্বস ম্যাগাজিন এই মাত্তালা রাজাপাকশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পৃথিবীর সবচেয়ে ফাঁকা বিমানবন্দর হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেখানে দৈনিক ফ্লাইটের সংখ্যা ২ এর বেশি না। একই শহরে মাহিন্দা রাজাপকশে তার পূর্বের আমলে চীনের কাছ থেকে ধার নিয়ে নিজের নামে মাহিন্দা রাজাপকশে সমুদ্র বন্দর বানিয়েছেন। ধার শোধ না করতে পারার কারণে বাধ্য হয়ে এই বন্দর শ্রীলঙ্কা চীনকে লিজ দিয়েছে। একই শহরে বিপুল অর্থ ব্যয়ে মাগামপুরা মাহিন্দা রাজাপাকশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়।

আয় বাড়ে, বৈষম্য বাড়ে কিন্তু ট্যাক্স কমে

ওয়াচডগের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় বা জিডিপি বাড়লেও ট্যাক্সের সাথে জিডিপির অনুপাত অনেকদিন ধরেই কমছিল। ১৯৯০ সালে এই অনুপাত ছিল ২০.৪%, ২০১৪-তে ১০.১%।

সর্বশেষ শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকশে নির্বাচনে জয়লাভ করে আভ্যন্তরীণ কর কমিয়েছেন। ফলে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত আর কমে ৮.৪% হয়েছে। গোতাবায়ে ভ্যাট ১৫% থেকে কমিয়ে ৮% করেছেন, আয়করের হার কমিয়েছেন, করমুক্ত আয়ের সীমা ৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩০ লাখ করেছেন। যেমন আয় তেমন আয়কর প্রথা বাতিল করেছেন। ফলে শ্রীলঙ্কার সরকারি রাজস্ব আয় কমেছে। ২০১৭ সালে এই রাজস্ব আয় ছিল ১০.৯৫৮ বিলিয়ন ডলার, ২০১৯ এ ৯.৭১৬ বিলিয়ন ডলার। ২০২০ সালে এসে এই রাজস্ব আয় কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ৬.৫৬৬৬ বিলিয়ন ডলার। অথচ শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং গিনি সহগ অনুসারে বৈষম্য ও বেড়েছে। অর্থাৎ ধনীদের হাতে টাকা আছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টাকা নেই।

মূল্যস্ফীতি

সরকারি আয়ের এই বিপুল পতনের পরও সরকারি উন্নয়নের বেলুন ফোলাতে মেগাপ্রজেক্ট গ্রহণে রাজাপাকশে সরকারের আগ্রহের কমতি ছিল না। ফলে আয় কমেছে কিন্তু সরকারি ব্যয় কমানো হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে অবধারিতভাবে বাজেট ঘাটতি হয়েছে আর সেই ঘাটতি মেটাতে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত টাকা (শ্রীলঙ্কান রুপি) ছাপতে শুরু করেছে। ফলে অবধারিতভাবে দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি। বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতির হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ ১৭.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমে যাওয়া

শ্রীলঙ্কা ২০০০ সালে তার জিডিপির ৩৯% আয় করত রপ্তানিখাত থেকে। ২০১৫-তে এই রপ্তানি আয় কমে জিডিপির মাত্র ২০% হয়ে যায়। রপ্তানি আয় না বাড়ার ফলে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪% (২০১৩) থেকে ২.৩% (২০১৯) হয়ে যায়। রপ্তানি আয় কমায় বৈদেশিক মুদ্রা আয় কমে যায়।

ক্রমহ্রাসমান রপ্তানি আয়ে আরেকটি ধাক্কা দেয় গোতাবায়ে সরকারে কৃষি উৎপাদনে প্রাকৃতিক পদ্ধতি চালু করা। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির ৩২.৩% অংশ হলো কৃষিখাত। রাবার, চা-নারিকেল, মশলা এগুলি শ্রীলঙ্কার কৃষিজাত পণ্য এবং রপ্তানিপণ্য হিসেবেও উল্লেখযোগ্য। বাইরে থেকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক আমদানি বন্ধ করে রাজাপাকশে সরকার হঠাৎ করে সারাদেশের ২০ লাখ কৃষকের জন্য গতবছর এপ্রিল মাস থেকে প্রাকৃতিক কৃষিব্যবস্থা চালু করে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়া আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম ৬ মাসে আভ্যন্তরীণ চাল উৎপাদন প্রায় ২০% কমে যায়। এর ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন ধরে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার পরও এবছর সেখানে চালের দাম ৫০% বৃদ্ধি পায় এবং প্রধান খাদ্য ভাতের অভাব পূরণ করতে দেশটিকে চাল আমদানিতে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হয়। কৃষিতে এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে দেশের প্রধান রপ্তানিপণ্য চা চাষ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ৪২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় কমে যায়। কৃষিতে শ্রীলঙ্কান সরকারের দীর্ঘদিনের ভর্তুকি কমাতে ও রাসায়নিক সার আমদানিতে ডলার ব্যয় কমাতে রাজাপাকশে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। কিন্তু এই উদ্যোগের ফলে শ্রীলঙ্কায় খাদ্য ঘাটতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখা দেয় যা, ব্যাপক গণবিক্ষোভের জন্ম দেয়।

অপরদিকে ডলার আয়ের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার একটি বড় খাত হলো প্রবাসীদের আয়। যেখান থেকে প্রত্যেক বছর ৭-৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হতো। কিন্তু ২০২১ সালে রাজাপকশে সরকার ডলারের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়ায় এই রেমিটেন্স ২০২২ সালের মার্চ মাসে ২.৮ বিলিয়ন কমে যায়। ফলে, এখানে একটা বিশাল ঘাটতি তৈরি হয়।

শ্রীলঙ্কার জন্য ডলার আয়ের আরেকটি খাত ছিল পর্যটন। যেখান থেকে বছরে দেশটির আয় ছিল ৩ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার। করোনা মহামারিতে এই খাত বিপর্যস্ত হওয়ায় এখান থেকে প্রায় অর্ধেক আয় কমে গেছে।

পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি

রাজাপাকশে পরিবার শ্রীলঙ্কার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সিংহলি জাতীয়তাবাদের ঝান্ডা তুলে ধরে দুর্নীতি-লুটপাট ও পরিবারতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে চলছে তারা। এর আগেও ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাহিন্দা রাজাপাকশে রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং সে সময় আইনসভা, প্রশাসন, কূটনৈতিক মহল, সরকারি প্রতিষ্ঠান সর্বত্র রাজাপাকশে পরিবারতন্ত্র কায়েম করার অভিযোগ উঠেছিল।

বর্তমান আমলের সরকারে রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপাকশে, প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশে তার ভাই। মন্ত্রীসভায় ৯ জন মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেটের ৩০টি পদের ৭টি তাদের পরিবারের দখলে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে অবাধ করার জন্য সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার সংবিধানে ২০তম সংশোধনী আনা হয়। নতুন এই সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বা নিয়োগ দিতে পারবেন, আড়াই বছর পার হলেই সংসদ বিলুপ্ত করতে পারবেন। এমনকি বিচারক ও পুলিশের কর্মকর্তাদের ও নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। ফলে রাষ্ট্রপতির প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য ছাড়া কেউ পদে টিকতে পারবে না। নতুন এই সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রপতি নিজে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব না নেয়ার বিধানকেও বাতিল করেছেন এবং প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা ক্যাম্পেইন এর রিপোর্টে বলা হয় যে, শ্রীলঙ্কার বাজেটের ২৪% নিয়ন্ত্রণ করে রাজাপাকশে পরিবার। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে পরিবারতন্ত্রের রাজত্ব চালাচ্ছে রাজাপাকশে পরিবার। এরমধ্যে আছে দুর্নীতির অভিযোগ। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির ভাই প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকশের ছেলে সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী নমল রাজাপকশে যিনি মাসখানেক আগে গণবিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছেন, তার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ান মেডিকেল ফার্ম এস্পেন থেকে দশ লাখ ইউরো ঘুষ নেয়ার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ কী খুব আলাদা?

উন্নয়নের প্রদর্শনী করতে গিয়ে ১৫ বছরে ৬.১৫ কিমি লম্বা পদ্মা সেতুর বাজেট ৪ দফা বেড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। ঢাকায় ২০ কিমি মেট্রো রেল নির্মাণ করতে খরচ হবে ২২ হাজার কোটি টাকা যার ১৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে জাইকা। বাংলাদেশের বর্তমান মোট ঋণ ৭৮ কোটি মার্কিন ডলার, যা জিডিপির ২২%। বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণ ৪৬০ মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩৯ হাজার টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় ৫৫৮ কোটি ডলার এবং রপ্তানি আয় মাত্র ৩১৬ কোটি ডলারের বিপরিতে বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ২৪১ কোটি ডলার। শ্রীলঙ্কা যেমন জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী না করে ঋণনির্ভর দৃশ্যমান উন্নয়নের পথে হেঁটেছিল, আমাদের পথও কী খুব আলাদা? শুধু শ্রীলঙ্কা নয় পৃথিবীর অনেক দেশেই ঋণ নির্ভর অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রদর্শন করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে কোন কূলই রক্ষা করতে পারেনি।

জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, জনগণের মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের দায়িত্ব হওয়ার কথা। অথচ শ্রীলঙ্কার রাজাপাকশে সরকার উন্নয়নের বেলুন ফোলাতে গিয়ে দেশীয় অর্থনীতির বারটা বাজিয়েছে, শ্রীলঙ্কার জনগণের জীবনের মৌলিক চাহিদা খাদ-ওষুধ, জ্বালানির নিশ্চয়তা তারা দিতে পারছে না। বিশ্বের পরাশক্তিগুলিও এই সুযোগে শ্রীলঙ্কার উপর আধিপত্য বিস্তারের এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লুটেরা শাসক ও সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলির এই খেলায় পরাজিত হয় কেবল জনগণ। এই সংকটের সমাধান শ্রীলঙ্কার জনগণকে রাজপথেই করতে হবে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই দেউলিয়া মডেলের কবর শ্রীলঙ্কার মাটিতে রচিত হোক, জনতার হাত ধরে আসুক সমতার সমাজ-এই আমাদের প্রত্যাশা। শ্রীলঙ্কার লড়াকু জনতার প্রতি জানাই সংগ্রামী অভিবাদন।

বিরোধী শক্তির সংগ্রামের দুর্বলতায় প্রমাণিত হয় না শাসকেরা অন্যায়-জুলুমকারি না



কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

সাধারণ সম্পাদক, বাসদ

[বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ *সাপ্তাহিক দেশ* পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি সাংবাদিক সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদকে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন, যা ২৯ এপ্রিল ২০২২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় সাক্ষাৎকারটি *ভ্যানগার্ড* পাঠকের জন্য পুনঃমুদ্রণ করা হলো–সম্পাদক।]

সাপ্তাহিক দেশ : দেশ কেমন চলছে? রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন আছে বলে মনে করেন? সার্বিক পরিস্থিতি কীভাবে দেখেন?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : যেমনভাবে দেশ চলছে তাতে ক্ষমতাবান, বিত্তবানরা দ্রুত গতিতে আরও বিত্ত-ক্ষমতা কুক্ষিতগত করছেন আর সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকা দুর্গতির কালোছায়ায় আছন্ন হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুস্থ্য, স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিকতার সকল সীমা ছাড়িয়েছে অনেক আগেই। এখন শাসকদের ক্ষমতা স্থায়ীকরণ আর বিপরীতে রাজনীতির ভিন্ন মেরুকরণের আভাস-পূর্বাভাস চলছে। সার্বিক পরিস্থিতি সামগ্রীকতার বিচারে ক্রমঅবনতির দিকে।

সাপ্তাহিক দেশ : আপনারা, বিশেষ করে বাম জোটের পক্ষ থেকে গত মার্চে হরতাল আহবান করেছিলেন। এরপর আর কোনো কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে না কেনো?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : হরতালে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। এখন সে জনমতকে সংগঠিত শক্তিতে টানার চেষ্টা চলছে। জনজীবনের প্রতিটি সমস্যাতেই জাতীয় ও স্থানীয়, দলীয় ও জোটবদ্ধ কর্মসূচি চলছে। হরতালের মতো সব কর্মসূচি একই চেহারায় প্রদর্শিত হয় না। কারণ প্রচার মাধ্যমের আগ্রহ অনাগ্রহের বিষয়টিও রয়েছে বলে।

সাপ্তাহিক দেশ : সরকারকে বিভিন্ন সময়ে বলা হচ্ছে তারা দুঃশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা কি আসলে? সরকারের আমলকে কেনো বলছেন দুঃশাসন?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল তার বিপরীতে দেশ শাসন করা কখনও সুশাসন হতে পারে না। মুক্তবাজারি, পুঁজিবাদী শোষণ নীতি, দুর্নীতি, একের পর এক কালোআইন তৈরি করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যখন যেভাবে খুশি যাকে খুশি তাকে বিদ্ধ করা, শাসন-প্রশাসনকে বশংবদ করে ব্যবহার করা, একবার বিনা ভোটে আরেকবার দিনের ভোট রাতে সম্পন্ন করার মতো বহু কুকীর্তি-দুঃশাসনের চেহারা এতটাই বড় এবং স্পষ্ট করে তুলেছে যে, বুঝার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ব্যাপারটা গণতন্ত্রের বদলে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার। স্বাধীনতার পর থেকে ৫০ বছরে এদেশের মানুষ গণতন্ত্রের মুখোশ দেখেছে, শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের মুখে শুনেছে, নিজের চোখে গণতন্ত্র দেখেনি; সুশাসনের প্রত্যাশা করেছে কিন্তু পায়নি। বর্তমান সরকার তার ব্যতিক্রমতো নয়ই বরং সম্প্রসারণ মাত্র।

সাপ্তাহিক দেশ : সরকারের ভালো কিছু কি চোখে পড়ে না?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : সরকারের তেলা মাথায় তেল ঢালা অর্থাৎ ধনীদের আরও ধনী, গরিবদের আরও গরিব করার নীতিতে বিত্তবানশ্রেণির জন্য অতিভালো খুবই দৃশ্যমান কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য তা কতোটা খারাপ তার পরিমাপ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

সাপ্তাহিক দেশ : জনগণ স্বতর্স্ফুতভাবে কেনা আপনাদের বা এমনকি বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দলের ডাকে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ছে না? সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিশ্চয়ই তারা খুশি। কী মত আপনার?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : ব্রিটিশের দুইশত বছরের শাসন ভারতবাসীর খুশির ফল ছিল না। একইভাবে পাকিস্তানি ২২ পরিবারের মাধ্যমে উপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠন ২৩ বছরব্যাপী স্থায়িত্ব পেয়েছিল, তাতেও বাঙালি জনগণের খুশির কারণে ছিল না। দুঃশাসন যতো দীয়র্ঘস্থায়ী হয় ততো কঠিন মূল্যে তা পরিশোধ করতে হয়। দেশের জনগণ বার বার জীবন দিয়ে তা পরিশোধ করেছে। ঝড়ের পূর্বাভাসকালে ঝড় দেখা যায় না। বরফ খণ্ডের বড় অংশ পানির নিচে থাকে দেখা যায় না। সময় অনেক কিছুর বিবেচনা কষে সময়ের কাজ সম্পন্ন করে। রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতা অন্যায়ের কিংবা জুলুমের সাফল্য প্রমাণ করে না।

সাপ্তাহিক দেশ : প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বামরা এখন বিএনপি জামায়াত জোটে। এব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? আবার মাঝে একথাও শোনা গিয়েছিলো সরকারের সাথে আপনাদের বিশেষ করে বাসদের সিট ভাগাভাগী নিয়ে সমঝোতা হতে যাচ্ছে. এ পুরো বিষয়ের ব্যাপারে কিছু বলুন।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : দেশের প্রধামন্ত্রী দায়িত্বশীল পদে থেকে দায়িত্বহীন কথা বললে বা অন্যদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ন হয়। বাসদ আদর্শবাদীতার রাজনীতি করে, নীতিহীনতার পথে হাঁটে না। ফলে কথিত সিট ভাগাভাগির উচ্ছিষ্ট ভোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাপ্তাহিক দেশ : কেমন লাগছে সাধারণ সম্পাদকে পদটা? দলকে নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ : এটা একটা বড় দায়িত্ব। দলের নীতি-আদর্শের বাস্তবায়নের সংগ্রামকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যৌথতার ভিত্তিতে দলের সকল শক্তিকে এবং জনগণের স্বর্থের দিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের যুক্ত করে সর্বোচ্চ সাধ্যে কাজ করে যাওয়া।

কমরেড সুফিয়া চৌধুরীর মৃত্যুতে বাসদের শোক প্রকাশ



কমরেড সুফিয়া চৌধুরী লাল সালাম

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুফিয়া চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর ১৩ এপ্রিল রাত ১টায় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ দলের একজন অকৃত্রিম দরদি বন্ধুকে এবং দেশ একজন প্রগতি ও সাংস্কৃতিমনা শ্রমজীবী মানুষ ও নারী মুক্তির আন্দোলনের সুহৃদকে হারালো।

কমরেড সুফিয়া চৌধুরীর প্রতি পুষ্পমাল্য প্রদান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমরেড রওশন আরা রুশো ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড কামরুজ্জামান।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম :

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নূরী এক বিবৃতিতে বলেন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সমর্থক কমরেড সুফিয়া চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর ১৩ এপ্রিল রাত ১টায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। একই সাথে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি আমৃত্যু সংগঠনের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছিলেন। সংগঠন তার এই ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

উজানের ঢলে হাওরের বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতিতে উদ্বেগ প্রকাশ

ফসল রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড ও প্রশাসন ব্যর্থ, দায় সরকারকে নিতে হবে

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৫ এপ্রিল '২২ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে উজানে ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জসহ হাওর এলাকার সহস্রাধিক হেক্টর জমির বোরো ধান তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং বাঁধ ও ফসল রক্ষায় দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকার-প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, হাওরের বোরো ধান দেশের খাদ্যের এক বড় অংশের জোগান দিয়ে থাকে। তাছাড়া এক ফসলি জমির ফলন সে এলাকার কৃষকও শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু হাওরের ফসল রক্ষা ও হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় আজও পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাওর উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারের কার্যকর কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হাওরের ফসল ও জীবন জীবিকা রক্ষায় বরাদ্দের সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের কোন নমুনা নাই বলে জনগণ মনে করে।

প্রতি বছরই হাওরে বাঁধ নির্মাণ-মেরামতের অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণের ফলে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, বাঁধ নির্মাণ সময়মতো শুরু ও শেষ না করার কারণে প্রকল্পের টাকা একদিকে লুটপাট হয়, অন্যদিকে বিলম্বে বাঁধের কাজ শুরু করায় বাঁধ না দিয়েই বৃষ্টিতে বন্যায় মাটি চলে গেলে টাকা তুলে নেয় ঠিকাদারেরা।

বিবৃতিতে বলা হয়, হাওর রক্ষায় কৃষক ফ্রন্টসহ বাম প্রগতিশীল কৃষক খেতমজুর সংগঠনসমূহ দীর্ঘদিন থেকেই সময়মতো সঠিক বাঁধ নির্মাণসহ নদীগুলো খননের দাবি জানিয়ে আসা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন না করায় প্রতি বছরই ফসল রক্ষার জন্য হাওরবাসীসহ দেশবাসীকে উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ২০১৭ সালেও এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভারত থেকে আসা ঢলে সুনামগঞ্জসহ দেশের হাওর অঞ্চলের ফসলের ক্ষতি হওয়ায় দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। এবারেও প্রায় একই সময়ে উজানে ভারত থেকে আসা ঢলে ফসল তলিয়ে যাচ্ছে। এখনও বোরো ফসল পুরোপুরি উঠার বেশ সময় প্রয়োজন। ফলে ফসল রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাওর উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকার প্রশাসনকে এখনই দ্রুত বাঁধ রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফসল রক্ষা ও খাদ্য সংকটের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য নেতৃবৃন্দ জোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হাওরের দরিদ্র কৃষককে চাষাবাদ করতে হয় ব্যাংক ও এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে। ফলে ফসলের ক্ষতি হলেও তারা ঋণ ও ঋণের সুদের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। এ ক্ষতি তাদের জীবনে নানামুখী দুর্ভোগ নিয়ে আসে। দেশের হাওর অধ্যুষিত ৮টি জেলার মানুষকে এযুগের পর যুগ একটা ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চাষাবাদ করতে হয়। হাওরের বন্যার ঝুঁকি অনিরসনীয় সমস্যা নয়। এ বিষয়ে সরকার ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

ইজিবাইক-ব্যাটারিচালিত যানবাহনের খসড়া নীতিমালা ২০২১ দ্রুত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করে লাইসেন্স প্রদান এবং সড়ক-মহাসড়কে বিকল্প লেন নির্মাণ করুন

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ

ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র চলাচলের অনুমতি প্রদান করে সুপ্রিম কোর্টের দেয়া আদেশে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করে অবিলম্বে ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য প্রণীত খসড়া থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১ চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করে লাইসেন্স প্রদান এবং সড়ক-মহাসড়কে বিকল্প লেন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপন ও সদস্যসচিব প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সংগ্রাম পরিষদ গত ১০ বছর যাবৎ নকশা আধুনিকায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ণ করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানসহ ৩ দফা দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু গত ২০১৪ সালের ৩ জুলাই ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কিছু মামলার প্রেক্ষিতে ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট এক রায় প্রদান করে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, 'ট্রাফিক কন্ট্রোলে পাবলিক ভেহিক্যালস বাই লজ' অনুযায়ি ব্যাটারিচালিত রিকশাকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান নেই'। সেই কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু আমরা জানি, ১৯৮৩ সালের মোটরযান আইন অনুযায়ি ইলেকট্রিক বা বিদ্যুৎচালিত মোটরযান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এ কারণে নতুন কোন নীতিমালার প্রয়োজন নেই। বরং হাইকোর্টের এই নির্দেশের অজুহাতে সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহল, পুলিশ ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করার নামে অসহায় রিকশা চালক ও মহাজনদের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদা আদায় করা শুরু করে এবং কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রিকশকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে ৩০-৪০ হাজার টাকা মূল্যের ব্যাটারি খুলে নিতে থাকে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সারাদেশে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তোলা হলে চাঁদাবাজরা কিছুটা সংযত হয়। দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে নকশা আধুনিকায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ণ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকসহ যান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়ে আসছে। ২০১৭ সালের ৭ নভেম্বর ও ২০২০ সালের ৬ মার্চ ঢাকায় বিশাল রিকশা শ্রমিক সমাবেশ করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে তিন দফা আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে বরিশাল মহানগ.রিতে সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব প্রকৌ.লী ইমরান হাবিব রুমন ও উপদেষ্টা ডা. ম.ষা চক্রবর্ত্তীসহ ৭ জন রিকশা প্রমিকনেতা প্রায় ১ মাস কারাভোগ করেন। সিলেটে সংগ্রাম পরিষদ নেতা আবু জাফর, প্রণব জ্যোতি পাল ও সুমনসহ প্রায় ২৫০ জন চালক সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় এখনও হয়রানির মধ্যে আছেন। সংগ্রাম পরিষদের অব্যাহত আন্দোলনের চাপে ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর 'ইলেকট্রিক মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৮-এর খসড়া তৈরি করে বিআরটিএ তা সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় পাঠায়। যেখানে রিচার্জেবল ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালিত মোটরযানকে ইলেকট্রিক মোটরযান বলা যাবে এবং কত চাকার গাড়িকে কত বছর মেয়াদি লাইসেন্স দেয়া যাবে, ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয় ঠিক করা হয়।

গত ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি এ নীতিমালা নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে একটি পর্যালাচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও গত ২০২১ সালের ১২ মার্চ ইজিবাইকের জন্য নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি) এক ওয়েবিনারে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠক থেকে তারা জানান ১৯৮৩ সালের মোটরযান আইন অনুযায়ী ইলেকট্রিক বা বিদ্যুৎচালিত মোটরযান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এ কারণে নতুন কোন নীতিমালার প্রয়োজন নেই। এর প্রেক্ষিতে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ২০২১ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিশাল শ্রমিক সমাবেশ থেকে লাইসেন্স প্রদানসহ ৩দফা দাবিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আন্দোলনের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে দু দফা বৈঠক করে ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইকের উপযোগিতা, কাঠামোগত দুর্বলতা নিরসন ও লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা সুপারিশ তৈরি করার জন্য বিআরটিএকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তারা তা জমা দেয়। ইতিমধ্যে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও গত ১০ জুন সংসদ ভবনে বৈঠক করে ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইককে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার সুপারিশ করেছিল। এর পূর্বে ২০১৮ সালে বুয়েট এর ম্যাকানিক্যাল বিভাগের ৩ জন শিক্ষককে ব্যাটারি রিকশা নকশা তৈরি করাসহ কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল নকশা আধুনিকায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ণ করে কাঠামোগত পরিবর্তন করে ব্যাটারিচালিত-বিদ্যুতচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করার বিষয়ে প্রকৌশলী, পরিবহন বিশেষজ্ঞ, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় অভিজ্ঞ মেকানিকদের নিয়োগ করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের যথোপযুক্ত নকশা এবং নিরাপদ ব্রেকের ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ সরকারকে যে কোন উদ্যোগে সহযোগিতা করার ও পরামর্শ দেওয়ার ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বুয়েটের মেক্যানিক্যাল বিভাগের চেয়ারম্যানসহ তিনজন শিক্ষক ব্যাটারি রিকশাকে নিরাপদ করার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন করে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে সরকারে কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। তারা বলেছেন, সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলে বুয়েটের মেকানিক্যাল বিভাগ কারিগরি দিক থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে। তারা আরও বলেছেন, ব্যাটারি রিকশার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে অটোমোবাইল শিল্পের যাত্রা শুরু হতে পারে। সারা দেশের ৫০ লাখ চালক ও সংশ্লিষ্ট সকলে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স প্রদান করার ঘোষণার প্রেক্ষিতে আশায় বুক বেঁধেছিল যে তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে। কিন্তু নীতিমালা তৈরি ও সুপারিশের পর হঠাৎ করে তড়িঘড়ি করে গত ২০ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরিবহণ মালিকদের উপস্থিতিতে টাস্কফোর্সের সভায় এই গণপরিবহণ বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ২১ জুন ২০২১ থেকে বরিশাল, ঢাকা, সিলেট, বগুড়া, দিনাজপুরসহ সারাদেশের প্রায় ৪০-৪৫টা জেলা-উপজেলায় সরকারের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারসহ ৪ দফা দাবিতে গড়ে উঠা প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপে প্রশাসন কিছুটা পিছু হটে। ৪ দফা দাবি ও নীতিমালায় ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইককে অন্তর্ভূক্ত করা সংক্রান্ত ৫ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে ২৯ সেপ্টম্বর ২০২১ ঢাকায় বিশাল সমাবেশ করে ও সারাদেশ থেকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেরিত (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ হস্তগত) ১৫ মার্চ ২০২১-এ পাঠানো স্মারকলিপির জবাব দিয়ে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ সংগ্রাম পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। সংগ্রাম পরিষদের দাবির প্রেক্ষিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিআরটিএ-র উপ-পরিচালক (ইঞ্জি.-১) মোঃ মাসুদ আলম স্বাক্ষরিত প্রেরিত পত্রে যাহার স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০০২.২১-৮৮৭-এ বলা হয়েছে, 'উপযুক্ত বিষয়ে ৩ নং সূত্রস্থ রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক তিন দফা দাবির মধ্যে নিম্নোক্ত দ্যাবির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

'নকশা আধুনিক ও নীতিমালা প্রণয়ণ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা/বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করত, প্রকৌশলী, পরিবহন বিশেষজ্ঞ, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় অভিজ্ঞ মেকানিকদের নিয়োগ করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের যথোপযুক্ত নকশা এবং নিরাপদ গতি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে।'

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন, দুর্ঘটনা কমানোর জন্য ১টি কমিটি তাদের সুপারিশের প্রায়োগিক দিকগুলো যাচাই বাছাইয়ের জন্য .ট কমিটি ও ইজিবাইকের সর্বজগ্রাহ্য কাঠামো এবং যাত্রী সুরক্ষার জন্য ডিজাইন/ড্রয়িং-এর জন্য বুয়েটের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব বুয়েটে দাখিল করে।

অব্যাহত আন্দোলনের চাপে সরকার 'খসড়া থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১ প্রণয়ন করে ৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সর্বসাধারণকে মতামত দেওয়ার জন্য ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সংগ্রাম পরিষদ ইলেকট্রিক মোটরযান ও থ্রি হুইলার উভয় নীতিমালার উপরে ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সড়ক পরিরহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বরাবর সংশোধনী প্রস্তাব পাঠায়।

সারাদেশের ৫০ লাখ চালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই যখন একটি নীতিমালার জন্য অপেক্ষা করছে সেই সময় গত ১২ ডিসেম্বর বাঘ ইকো মোটরস নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত ব্যাটরিচালিত যানবাহন একচেটিয়াভাবে দেশের রাস্তায় চলাচল করার সুবিধার্থে হাইকোর্টে ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করে, হাইকোর্ট ১৫ ডিসেম্বর এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে ইজিবাইক উৎপাদন, বিপণন, আমদানি ও সারাদেশে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর প্রেক্ষিতে সংগ্রাম পরিষদ হাইকোর্টের অন্তর্বতীকালীন আদেশ পুনর্বিবচনা করার জন্য একদিকে আইনি লড়াই ও অন্যদিকে ৬ দফা দাবিতে সারাদেশের রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলে। দীর্ঘ ৩ মাস আইনি লড়াই শেষে গত ৪ এপ্রিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ এক আদেশে মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র চলাচলের আদেশ প্রদান করে। যা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের পক্ষে একটি যুগান্তকারী রায়।

বিবৃতিত নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশের চালক, মেকানিক, ক্ষুদে মালিক, গ্যারেজ মালিকসহ প্রায় ৫০ লাখ মানুষ ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সাথে সরাসরি যুক্ত। এর সাথে তাদের উপর নির্ভরশীল প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষ। সুপ্রিম কোর্টের এ আদেশের ফলে এ সেক্টরের মানুষ সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি ও আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু সাময়িক স্বস্তি আসলেও পুরো সংকট নিরসনে আরও অনেক উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-সারাদেশে চলাচলরত ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত প্রায় ৪০ লাখ যানবাহন নিবন্ধন, রুট পারমিট ও লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকার প্রণীত খসড়া 'থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১ চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন দ্রুত করতে হবে। দেশের সড়ক-মহাসড়কসমূহ জেলা-উপজেলাসহ বাজারের পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে গিয়েছে। ফলে গণপরিবহন না থাকায় ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন ছাড়া এ সমস্ত স্থানে চলাচল করা অত্যন্ত কঠিন। মহাসড়কে ইজিবাইকসহ স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেন বা সার্ভিস রোড় নির্মাণ না করলে সড়ক-মহাসড়কে সার্বিক শৃঙ্খলা যানজট নিরসন করা যাবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সেক্টর ঘিরে সারাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও তাদের পরিবহন নিয়ে একদল স্বার্থান্বেষী মহল ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী মিলে সিন্ডিকেট গড়ে তোলার অপচেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে দেশের প্রশাসনকে কঠোর ও সারাদেশের ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সাথে যুক্ত চালকসহ সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং চূড়ান্ত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ন্যায্য দাবি আদায়ে সবাইকে ঐকবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ : গাইবান্ধা জেলা

বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় শ্রমজীবীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করার লক্ষ্যে ১৩ মে গানাসাস মিলনায়তনে জেলা বাসদ আহ্বায়ক গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাংস্কৃতিক কর্মী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড আমিনুল ইসলাম গোলাপ, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, গণফোরাম জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ময়নুল হোসেন রাজা, বাসদের সাবেক সমন্বয়ক জয়নাল আবেদীন রাজু, সহিদুল ইসলাম, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি প্রণব চৌ, অ্যাড. আশরাফ সিপিবি'র জেলা সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল, ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র জেলা সভাপতি রেবতী বর্মণ, জেলা নেতা মৃণাল কান্তি, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের জেলা আহবায়ক অ্যাড. নওশাদুজ্জামান নওশাদ, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, বাসদ জেলা সদস্যসচিব সুকুমার চন্দ্র মোদক, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের জেলা আহ্বায়ক ইসরাত জাহান, সদস্য আফরোজা বেগম, বাসদ জেলা নেতা পরিতোষ কুমার, সাবেক বাসদ নেতা প্রভাষক শফিউল ইসলাম, প্রভাষক আব্দুর রাজ্জাক রেজা, আব্দুর রউফ, সাবেক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা শিক্ষক পারভীন আক্তার, দুলালী আক্তার দোলা, মইনুল ইসলাম প্রমুখ।

মে দিবসের আহ্বান

ন্যায্য মজুরি, ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস নিশ্চিত করুন

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

১৩৬তম মহান মে দিবসে সকলের কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি, মর্যাদা, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং সকলক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস বাস্তবায়নের দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এর সঞ্চালনায় ১ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অর্থ সম্পাদক জুলফিকার আলী, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. বিমল চন্দ্র সাহা, সদস্য আফজাল হোসেন, ঢাকা নগর সভাপতি রতন মিয়া। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের জিডিপি বাড়ছে, মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৮২৪ ডলার, (৯০ টাকা ডলার ধরলে ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক ১ লাখ ১১ হাজার টাকা), বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ, পৃথিবীর বহুদেশ বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নের মডেল মনে করে। এ সমস্ত কথা আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রতিদিন শুনছি। কিন্তু বাংলাদেশের এই উন্নতির পিছনে প্রধান শক্তি যে শ্রমিক তারা কত মজুরি পায়? পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা শ্রমিক বাংলাদেশে। সে কারণেই দেশে ও বিদেশে মালিকদের এত সম্পদ। গার্মেন্টস, নিট, সুয়েটার, রি-রোলিং, পাট, চা, তাঁত, যানবাহন চালকসহ পরিবহন শ্রমিক, মোটর মেকানিক, রিকশা চালক, দোকান ও হোটেল কর্মচারীসহ সরকার ঘোষিত ৪৩টি সেক্টরের শ্রমিকদের যে মজুরি তাতে মানসম্পন্ন জীবনযাপন করা অসম্ভব। মালিকরা সংগঠিত কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠন করার পথে শত বাধা বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত মিলে প্রায় ৭ কোটি শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করেও নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে পারছে না অন্যদিকে কয়েক লক্ষ কোটিপতির জীবনে বিলাসিতার শেষ নেই। শ্রমিকদেরকে শোষণ করেই তাদের এই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকরা সচেতন হলে এই অন্যায় শোষণের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। সে কারণে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পথে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। শ্রম আইন, বিধিমালা, প্রশাসন, পুলিশ, মাস্তান, শ্রমিকনেতা নামধারী একদল দালালদের ব্যবহার করে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত হতে বাধা দেয়। কারণ, সংখ্যায় বেশি হলেও অসংগঠিত শ্রমিক সবসময় দুর্বল ও অসহায়। পুঁজিবাদ টিকে আছে শ্রমিক শোষণ করে, মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে এই ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শ্রমিকের শ্রম ঘণ্টা কমার কথা কিন্তু মালিকরা মজুরি এতটা কমিয়ে দিয়েছে যে, ওভার টাইম না করলে সংসার চালানো কঠিন।



নেতৃবৃন্দ বাজার দর ও মাথাপিছু আয় বিবেচনা করে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা এবং শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বলেন, মহান মে দিবসে শ্রম অধিকার সংকোচনের সকল জাল ছিন্ন করে উৎপাদনের অনুপাতে মালিকানা এবং জীবীকার জন্য জীবন নয় বরং জীবনের জন্য জীবীকা এই নীতির ভিত্তিতে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রত্যয় নতুন করে ধারণ করতে হবে।

লাইসেন্স প্রদানের নামে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করে প্রতারকচক্রের নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ

বরিশালে ব্যাটারিচালিত রিক্সা, ভ্যান-ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ইজিবাইকের লাইসেন্স নিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজিচক্রের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এবং ব্যাটারিচালিত যানবাহনের খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করে BRTA কর্তৃক লাইসেন্স প্রদানে দাবিতে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১৩ মে ফকিরবাড়ি রোড বাসদ কার্যালয়ে বরিশালে সংবাদ সম্মেলন ও ১৬ মে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পার্কিং স্ট্যান্ড নির্ধারণ, জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল-ড্রেন ও ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে অশ্বিনী কুমার হলচত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।



ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে ১৭ মে ২০২২ বরিশাল শহরে অনুষ্ঠিত সমাবেশ

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বাসদ বরিশাল জেলার সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, জেলা সংগঠক মানিক হাওলাদার, জেলা সংগঠক গোলাম রসুল, বরিশাল রিকশা-ভ্যান চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং ২৩২৪)-এর সভাপতি দুলাল মল্লিক, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, সংগ্রাম পরিষদের ২৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি শাহীন শরীফ, ২১ নং ওয়ার্ড সভাপতি ফজলুর, ১ নং ওয়ার্ড সভাপতি মো. মানিক, ২২ নং ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাওলাদার প্রমুখ।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, আপনারা জানেন ব্যাটারিচালিত রিকসা-ভ্যান-ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে বরিশালসহ সারাদেশে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্সের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। ব্যাটারিচালিত যানবাহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গত ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বে আপিল করা করা হয়। আমাদের শ্রমিকদের দায়ের করা ২টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে '২২ সালের ৪ এপ্রিল প্রধান বিচারপতির নেতৃতে ৫ জন বিচারকের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ২৫ এপ্রিল মহাসড়ক ছাড়া সর্বত্র ইজিবাইক চলাচলের অনুমতি প্রদান করে। হাইকোর্টের এই রায় সর্বস্তরের ইজিবাইক শ্রমিকদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনলেও একদল কূচক্রী এই রায়কে পুঁজি করে শ্রমিকদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে বরিশাল জেলা ও মহানগর ইজিবাইক ও অটোরিকসা শ্রমিক কল্যাণ সংগঠন নামে একটি সংগঠন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে ইজিবাইকের লাইসেন্স দেয়ার কথা বলে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করছে। এই সংগঠন কর্তৃক ও ক্ষমতাসীন দলের কিছু প্রভাবশালী নেতাদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের কাছ থেকে লাইসেন্সের বদলে নগদ অর্থ চাওয়ার অভিযোগও শ্রমিকরা করছে। অথচ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অদ্যাবধি কোন ঘোষণায় বা প্রজ্ঞাপনে এই কথা বলা হয়নি এবং লাইসেন্স শাখায় খোঁজ নিলেও কেউ এবিষয়ে কোন তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, তথাকথিত কল্যাণ সংগঠনসহ বরিশালের বিভিন্ন এলাকার ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে বিটবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ইজিবাইক শ্রমিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা তোলার কারণে এদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ ৯ জন নেতার বিরুদ্ধে ২০২০ সালে ডিসি ট্রাফিক নিজে বাদি হয়ে চাঁদাবাজির মামলা করেছিলেন, যা অদ্যবধি চলমান আছে। এছাড়া কাশিপুরে ২০২০ সালে ইজিবাইক শ্রমিকদের কাছ থেকে বিট বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলা হয় ও এলাকার প্রভাবশালী চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় যেখানে ইতিমধ্যে তদন্ত প্রতিবেদনে চাঁদাবাজির বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। চৌমাথা এলাকায়ও তদ্রুপ বিটবাণিজ্যে জড়িত প্রভাবশালী একটি মহলের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের মামলায় অর্জিত হাইকোর্টের রায়কে পুঁজি করে এই কুচক্রী মহল পূর্বের ন্যায় চাঁদাবাজি শুরু করার জন্য নতুনভাবে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্সের দাবিতে আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন, সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে লাইসেন্সের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে 'থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

শ্রমিক কর্মচারী ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য রেশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সুলভ মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ দাবি

অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

স্কপ



১৮ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ। স্কপ যুগ্মসমন্বয়ক চৌধুরী আশিকুল আলমে সভাপতিত্বে এবং আহসান হাবিব বুলবুলের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্কপ নেতা শহিদুল্লাহ চৌধুরী, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল কাদের হাওলাদার, রাজেকুজ্জামান রতন, কামরুল আহসান, শামীম আরা, আজিজুন নাহার, আব্দুর রাজ্জাক, নূরুল আমিন, সরদার খোরশেদ, কামাল সিদ্দিকী, রফিকুল ইসলাম, আবু নাঈম খান বিপ্লব প্রমুখ।

'সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এস.ডি.জি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এস.ডি.জি'র ১৭টি লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য দেশে কোনো দারিদ্র থাকবে না, দ্বিতীয় লক্ষ্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির উন্নয়ন, অষ্টম লক্ষ্য শোভন ও পূর্ণকালীন কাজ নিশ্চিত করা, দশম লক্ষ্য বৈষম্য বিলোপ। করোনা পরবর্তীতে দারিদ্র্য বেড়েছে, বেড়েছে অপুষ্টি, কর্মহারিয়ে অনিশ্চয়তায় ধুঁকছে লক্ষ লক্ষ পরিবার, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র হয়েছে। এই সময়ে এস.ডি.জি অর্জন করতে হলে প্রায় ৭ কোটি শ্রমজীবী মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তাদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে ভর্তুকি মুল্যে নিত্যপণ্যের রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে, সুস্থ কর্মী উৎপাদনের অন্যতম শর্ত তাই শ্রমজীবীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আবাসন নিশ্চিত করতে হবে। দেশে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তার জন্য সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করতে হবে। আর সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ, কৃষি ভর্তুকির টাকা অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেখালে তা এস.ডি.জি অর্জনের আন্তরিকতার অনুপস্থিতিই প্রমাণ করবে।

নেতৃবৃন্দ বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নয়টি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধরকদের প্রতি আহবান জানান।

- ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য শ্রমিক কর্মচারীসহ নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ভর্তুকি মূল্যে রেশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সুলভ মূল্যে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দ করা।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত হলে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনসহ সামাজিক বেষ্টনীর জন্য বরাদ্দ রাখা।
- বাজেটে পাট, চিনি শিল্পসহ রাষ্ট্রীয় কল-কারখানাসমূহ পুনরুদ্ধার ও রক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা সামজিক সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবী হাসপাতাল, শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা।
- অর্থ পাচারকারী, ঋণ খেলাপিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে প্রাপ্ত অর্থ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা।
- দুর্নীতিরোধে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ না রেখে তা বাজেয়াপ্ত ও আদায় করে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া।
- শ্রমজীবীদের জন্য সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা।
- ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কর্মসংস্থান ভিত্তিক উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা।

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব—১। পুঁজির সঙ্গে মজুরি শ্রমের সম্পর্ক, মজুরদের গোলামি, পুঁজিপতির প্রভুত্ব; ২। বর্তমান ব্যবস্থায় মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণিগুলির ও তথাকথিত কৃষক-সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবী পতন; ৩। ইউরোপীয় নানা জাতির বুর্জোয়া শ্রেণির উপর জগৎ-জোড়া বাজারে স্বৈরাচারী প্রভু ইংলন্ডের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব ও শোষণ।

আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সহজ ও সাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করব। অর্থশাস্ত্রের অতি প্রাথমিক সব ধারণাও পাঠকের আছে বলে ধরে নেব না। মজুরেরা আমাদের কথা বুঝুক, এই আমাদের ইচ্ছা। তাছাড়া, জার্মানির সর্বত্র বর্তমান ব্যবস্থার পেটেন্ট-প্রাপ্ত সমর্থনকারী থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক অসম্ভব সম্ভবকারী এবং অখ্যাতনামা যেসব রাজনৈতিক প্রতিভাধরের সংখ্যা খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানির কর্ণধারদের চাইতেও বেশি তাদের সকলের মধ্যেই অতি সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও একান্ত অজ্ঞতা ও ভাব-বিভ্রান্তি বর্তমান।

তাহলে প্রথম প্রশ্নটি এখন তোলা যাক: মজুরি কী? কীভাবে তা নিরূপিত হয়?

মজুরদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনাদের মজুরি কত?' তাহলে কেউ উত্তর দেয়; দিনে এক মার্ক করে আমার মালিক আমায় দেয়।' কেউ বলে, আমি পাই দুই মার্ক, ইত্যাদি। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বিভিন্ন মজুর নিজ নিজ মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য—যেমন, এক গজ কাপড় বোনা বা বইয়ের এক ফর্ম কম্পোজ করার জন্য—ভিন্ন ভিন্ন মজুরির উল্লেখ করে তারা। নানা রকম কথা বললেও এক বিষয়ে সবাই একমত : একটা নির্দিষ্ট সময়ের শ্রমের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ তোলার জন্য পুঁজিপতি যে অর্থ দেয় তাই মজুরি।

কাজেই, মনে হয়, পুঁজিপতি যেন টাকা দিয়ে মজুরের শ্রম ক্রয় করে, টাকার বদলে মজুরেরা তার কাছে শ্রম বিক্রয় করে। কিন্তু এ হচ্ছে শুধু বাইরে থেকে দেখা। আসলে তারা পুঁজিপতির কাছে টাকার বদলে যা বিক্রয় করে সেটা তাদের শ্রমশক্তি। একদিন একসপ্তাহ বা একমাস ইত্যাদির জন্য পুঁজিপতি তাদের এই শ্রমশক্তিটা কিনে নেয়। কেনার পর সে এ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ সময়টার জন্য মজুরদের খাটিয়ে। যে পরিমাণ টাকা দিয়ে, ধরুন দুই মার্কা দিয়ে, পুঁজিপতি তাদের শ্রমশক্তি কিনল, তা দিয়ে। সে দু পাউন্ড চিনি বা নির্দিষ্ট পরিমাণের অন্য যে কোনো পণ্যও কিনতে পারত। যে দুই মার্ক দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি কেনে, সে টাকাটা হলো এই দু-পাউন্ড চিনির দাম। যে দুই মার্ক দিয়ে সে বারো ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য শ্রমশক্তি কিনেছে, তা হচ্ছে বারো ঘণ্টার শ্রমের দাম। কাজেই শ্রমশক্তি হুবহু, চিনির মতোই একটা পণ্য। প্রথমটির মাপ ঘড়িতে, দ্বিতীয়টির মাপ তুলাদণ্ডে।

মজুরেরা তাদের পণ্য, শ্রমশক্তিকে বিনিময় করে পুঁজিপতির পণ্যের জন্য, টাকার জন্য, এবং এই বিনিময় হয় একটা নির্দিষ্ট হারে। এত ঘণ্টা শ্রমশক্তি ব্যবহার করার দরুন এই পরিমাণ অর্থ। বারো ঘণ্টা তাঁত চালাবার জন্য দুই মার্ক। কিন্তু এই দুই মার্ক দিয়ে অন্য যে-যে পণ্য কেনা যায়, এই দুই মার্ক কি সে-সব পণ্যের তুল্য নয়। অতএব বাস্তবিক পক্ষে, মজুর তার পণ্য, শ্রমশক্তিকে বিনিময় করেছে অন্যান্য সকল রকমের পণ্যের সঙ্গে এবং একটা নির্দিষ্ট হারে। তার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে দই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাকে আসলে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাংস, কাপড়, জ্বালানি কাঠ, আলো ইত্যাদি দিয়েছে। সুতরাং শ্রমশক্তি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যে হারে বিনিময় করা হয় সেই হার বা শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্য ব্যক্ত হচ্ছে এই দুই মার্কে। কোনো পণ্যের বিনিময় মূল্যকে টাকার হিসেবে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই পণ্যের দাম। শ্রমশক্তির দাম, সাধারণত যাকে বলা হয় শ্রমের দাম, তার একটা বিশেষ নামই হচ্ছে মজুরি, মানুষের দেহ ছাড়া এই অদ্ভুত পণ্যটির আর কোনো আশ্রয় নেই।

যে-কোনো মজুরের কথা ধরা যাক। ধরুন একজন তাঁতি। পুঁজিপতি তাকে তাঁত ও সুতো জোগায়। তাঁতি কাজে লাগে, সুতো কাপড়ে রূপান্তরিত হয়। পুঁজিপতি এই কাপড় নিয়ে, ধরুন, কুড়ি মার্কে বিক্রয় করে। তাঁতির মজুরিটা কী এই কাপড়ের, এই কুড়ি মার্কের বা তার শ্রমফলের একটা অংশ? কোনো মতেই নয়। কাপড় বেচার অনেক আগে, সম্ভবত, বোনা শেষ হবার অনেক আগেই তাঁতি তার মজুরি পেয়ে গেছে। কাজেই, কাপড় বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে পুঁজিপতি তার মজুরি দেয় না, বর ইতিপূর্বে তার হাতে যে অর্থ ছিল তা থেকেই দেয়। মালিকের যোগানো তাঁত আর সুতো যেমন তাঁতির উৎপন্ন দ্রব্য নয়, ঠিক তেমনি, তাঁতি তার নিজস্ব পণ্য অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে পণ্য পেল, তাও তার উৎপন্ন দ্রব্য নয়। এও সম্ভব, মালিক তার কাপড়ের কোনো ক্রেতাই পেল না। হতে পারে, যা মজুরি দেওয়া হয়েছে, কাপড় বিক্রয় করে সেটুকুও উঠল না। আবার এও সম্ভব, তাঁতির মজুরির তুলনায় বেশ লাভেই সে তা বিক্রয় করল।

তাঁতির সঙ্গে এসবের কোনো সংস্রব নেই। পুঁজিপতি যেমন তার মজুত ধনের, তার পুঁজির একাংশ দিয়ে কাঁচামাল-সুতো এবং শ্রমের হাতিয়ার—তাঁতটি কেনে, তেমনি তার ধনের আর এক অংশ দিয়ে তাঁতির শ্রমশক্তিও ক্রয় করে। এই সব জিনিস—কাপড়ের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি সমেত এইসব জিনিস কেনা -কাটার পরে

পুঁজিপতি শুধু নিজস্ব কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার দিয়েই উৎপাদন করছে। কেননা আমাদের তাঁতিটিও এখন ঐ শ্রমের হাতিয়ারেরই অন্যতম, উৎপন্ন দ্রব্যে বা তার দামে যেমন তাঁতের কোনো বখরা নেই, তেমনি তাঁতিরও নেই। কাজেই, মজুরিটা মজুরের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।

চাঁদপুরে রক্তধারা স্মৃতিসৌধের পাদদেশে চা-শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত



চা-শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক ২০ মে 'চা-শ্রমিক দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্ট চাঁদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রেল স্টেশনে অস্থায়ী স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও বিকেলে ডাকাতিয়া-মেঘনা নদীর মোহনায় শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আবু তাহের বন্দুকসির সভাপতিত্বে রক্তধারা স্মৃতিসৌধের পাদদেশে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড শাহাজাহান তালুকদার, বাসদ কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য ইমরান হাবিব রুমন, দীপালী রানী দাস, হারুন অর রশীদ ও জয়দেব কর্মমার।

নেতৃবৃন্দ চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকার দাবি জানান।